স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই জন্য ভারতের নগর, গ্রাম, পল্লী, সকল স্থানেই শিক্ষিতা ও সার্টিফিকেট-প্রাপ্তা ধাত্রীর আবশ্যক। অশিক্ষিতা ধাত্রী ও অনভিজ্ঞ কবিরাজের হাতে বিপৎ-কালে স্ত্রীলোকদিগকে আর ফেলিয়া রাখা আমাদের উচিত নহে। এখন নারীরা নিজেই একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই কত স্ত্রীলোক ও শিশুকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে ও কত বালিকা জননীকে চিররোগের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। এমন সুমহৎ কাজের দ্বার আমাদের সম্মুখে খোলা থাকিতে কেবল লোকলজ্জাভয়ে উহা হইতে বহির্ভূত থাকা কি আমাদের আর ভাল দেখায়?

উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইলে ডাক্তারীতে মাসে ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত, এবং ধাত্রীবিদ্যায় মাসে ১৫৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হয়। বিশেষতঃ, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে এখন যত শিক্ষিত হইতেছে, ভাল ডাক্তার ও ধাত্রীর ততই অধিক আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। বুদ্ধিমতী মা ও শাশুড়ীরা তাঁহাদের প্রাণের কন্যা ও বধূদিগকে সঙ্কটকালে অশিক্ষিতা ধাত্রী বা কবিরাজের হাতে দিতে আর ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কেবল নিকটে ভাল ধাত্রী ও ডাক্তার না থাকাতেই তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐরূপ করিতে বাধ্য হন।

এই কয়েকটী মানসিক শ্রমের কাজের পর শারীরিক শ্রমের কাজ আমাদের সম্মুখে আসে। আশা করি, বালিকাগণ ও স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, যে কোন কাজ, উহা যতই সামান্য হউক না কেন, উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অভ্যাস ও পরিশ্রমের আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত কাজে মানসিক অভ্যাস ও ধারাবাহিক শ্রমের যেমন আবশ্যক, শারীরিক শ্রমের সকল কাজেই সেইরূপ হাত ও চোকের অভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক; সুতরাং কোন নারী অতিশয় জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও ঐ দুইটী সাধারণ গুণ ব্যতীত কখন কোন কাজে সফল হইতে পারিবেন না। হাতের লেখা খুব ভাল হইলে অনেক সময়ে ঘরে বসিয়াই কিছু উপার্জ্জন করা যায়। আমার পরিচিত দুইটী স্ত্রীলোক তাঁহাদের স্বামীর আফিসের জন্য লিখিয়া প্রত্যেকে মাসে ১৫৲। ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিধবা হইবার পর ৩০৲ টাকার পর্য্যন্ত কাজ পাইতেন। কেরাণী-দিগের লেখার কাজ হইতে মেতরদের ঝাড়ু দেওয়া পর্য্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের কাজের মধ্যে পারগণিত। আর ধনী,

দরিদ্র, ভদ্র, ছোট, সব স্ত্রীলোকদেরই উহা আয়ত্তাধীন। অবশ্য উহার মধ্যে পরিষ্কার অপরিষ্কার অনুসারে ভাল মন্দ বিভাগ আছে। কিন্তু আমাদের সে সকল বিভাগে না গিয়া কেবল স্ত্রীলোকের উপযোগী কাজের কথাই লেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ সামাজিক প্রতিবন্ধক বশতঃ ঐ সকল নানা প্রকার কাজে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের প্রবেশের অধিকারও নাই। তবে যে সকল কাজ গৃহস্থ ও দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসিয়া ও পাড়াপ্রতিবাসীর বাড়ী গিয়া করিতে পারেন, আমি তাহাদেরই উল্লেখ করিব।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই অসহায়া নারীদিগের জীবিকার জন্য অধিক কষ্ট দেখা যায়। পল্লীগ্রামবাসিনীদের সচরাচর দুই চারি বিঘা ভূমি থাকে, আর সেখানে জিনিষপত্রও শস্তা, সেজন্য ঐ ভূমি হইতেই বিধবারা নিজের ও সন্তানদের এক প্রকার আহারাদি যোগাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, সূতা ও পৈতা কাটা, শিকে ও দড়ি বিনান, কড়ির ঝাড় গাঁথা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারাও তাঁহারা ভদ্রভাবে এক-রূপে জীবিকা চালাইতে পারেন। কিন্তু সহরের নিঃস্ব অনাথা রমণীদিগের পারিবারিক ক্লেশ দেখিলে দুঃখে আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিধবা ও দুই তিনটী সন্তান রাখিয়া স্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভরণপোষণের উপায়ও চলিয়া গিয়াছে। অনাথিনী এই তীব্র শোকের মধ্যে ছেলেদিগকে কি খাইতে দিবেন ভাবিয়া চতুর্গুণ যন্ত্রণা পাইতেছেন। হয়ত দিন দুই চার দয়ালু পাড়া-প্রতিবাসীরা বিধবাকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন। কিন্তু তাঁহারা ত আর প্রতিদিন তাঁহাদের আহার যোগাইতে পারেন না। বিশেষতঃ, দুর্ভাগ্যক্রমে অভাগিনী বাল্যকালে এমন কোন কাজে শিক্ষিতা হন নাই, যাহা দ্বারা এখন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন। হয়ত বহুদিন অনাহারে থাকিয়া বিধবাও তাঁহার শিশুদের সঙ্গে স্বামীর অনুগামিনী হন; কিম্বা, ভদ্রবংশীয় হইলেও, ক্রমে পেটের জ্বালায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মান সম্ভ্রম সব জন্মের মত লোপ পায়। তাঁহার সন্তানদিগকে ভিক্ষুকের সন্তানের ন্যায় কর্কশ আচরণ সহ্য করিতে হয়। এক কথায়, তাঁহাদিগের এইরূপে জীবন ধারণ মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়া উঠে।

এইরূপ দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কন্যাদিগকে বাল্যকাল হইতে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী কোন কাজ শিক্ষা দেওয়া কি প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে? ঐ সকল কাজের মধ্যে সেলাই একটী প্রধান কাজ। উহা শিখিতে কোন প্রকার ব্যয় বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের আবশ্যক নাই। অথচ উত্তমরূপে জামা প্রভৃতি সেলাই বা রিপুর কাজ জানিলে উহা দ্বারা মাসে অন্ততঃ তিন চারি টাকা উপার্জ্জন করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

আজকাল সর্ব্বত্রই জামা ও সায়া পরার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, আর অনেক নব্য মহিলা ইংরাজী ধরণের বডিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ স্থলে মুসলমান পুরুষ-দর্জ্জীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকেরা যদি একজন স্ত্রী-দর্জ্জী পান, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। আমি জানি, অনেক সময়ে গায়ের মাপ দেওয়াতে ও জামা ছোট বড় করাতে পুরুষ-দর্জ্জির কাজে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের বড়ই অসুবিধা হয়। তাঁহারা দাসীদিগের দ্বারা অনেক বলিয়া কহিয়াও ঠিক মনের মত জিনিষটী প্রস্তুত করাইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় পাড়ার একজন স্ত্রীলোক সেলাইয়ের কার্য্যে দক্ষ থাকিলে কত সময় বাঁচে ও কত বৃথা বকাবকি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সে অন্তঃপুরে গিয়া নিজের হাতে স্ত্রীলোকদিগের গায়ের মাপ লইতে ও নিজের কাণে শুনিয়া ঠিক তাহাদিগের মনের মত জামা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। উহাতে দুই পক্ষেরই উপকার হয়। সেলাই আরম্ভ করিতে বেশী শিক্ষা বা জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, কেবল একটু বুদ্ধি ও চতুরতার প্রয়োজন। আর আমাদের বোধ হয়, সেলাইয়ের উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদিগের দেশের সাধারণ সকল স্ত্রীলোকেরই আছে। চারি আনা বা আট আনা দিয়া কতকগুলি চিকণ সুতার গুলি, ছুঁচ ও একখানা কাঁচি কিনিলেই সেলাইয়ের সকল সরঞ্জাম ঠিক হইল।

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"ভাবময়ীনাম্নী আর একটি সুন্দরী বালিকাকেও তুই লুকাইয়া রাখিয়াছিলি, পরে আমি তাহাও জানিতে পারিলাম; এবং ফকিরের বেশে তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়াছিলি, জানিবার জন্য তোর কাছে গেলাম। তোকে ভূতের ভয় দেখাইয়া ও নানারূপ ছলনা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলাম। তুই ভয়ে অস্থির হইয়া তাহারা যেখানে রহিয়াছে, "রাজ" বলিয়া তাহার আভাস দিলি। তৎপরে দেখিলাম দেবদত্তপত্নী শোকে অধীর হইয়া একমাত্র নন্দকের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি বুঝিলাম ইহাদিগকে খোঁজ করিয়া বাহির করা একা নন্দকের কর্ম্ম নহে। অতএব তাহাকেও ছলনাপূর্ব্বক বাহির করিয়া সঙ্গী করিয়া লইলাম। ইহার পরে ভবভূতির সঙ্গেও আলাপ হইল।

এদিকে চন্দনী নন্দক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ও তাহাকে অলক্ষণ বিশ্রামানন্তর পানাহার করাইয়া পাহাড়ে আরোহণ

করাইবার জন্য নিজে পাহাড়ে আরোহণ করিল।

চন্দনী আমাকে বলিয়াছিল যে, প্রথমে সে নন্দককে সঙ্গী করিতে ইচ্ছা করে নাই। কিন্তু নন্দক যখন কোন মতেই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না, তখন সে তাহাকে অল্পক্ষণ বিশ্রাম ও পানাহার করাইয়া তোর আড্ডায় লইয়া যাইতে মনঃস্থ করিয়াছিল এবং তাহাকে পাহাড়ে আরোহণ করাইবার জন্য পাহাড়ে উঠে ও পাছে নন্দকের নাক, মুখ বালীর মধ্যে গাড়িয়া যায় এই ভয়ে সে তাহাকে অতি যত্নের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া খাড়া ভাবে বালীর স্তূপের উপর পতিত হয়। তোর লোকও সেই দিন সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। সে লোকটার সেখানে যাওয়ার জন্য সেই দিনই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সপ্তাহের মধ্যে ঐ দিনই সে সেখানে আসিত। চন্দনীও সেখানে লুকাইয়াছে ইহা আমি না দেখিয়াও বেশ বুঝিতে পারিলাম। চন্দনী ও আমি দিনের বেলায় ঐরূপ ভাবেই লুকাইয়া থাকিতাম। ইহার পর আমি গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া লুকাইয়া রহিলাম।

ঐ দুর্দ্দান্ত লোকটি বাহির হইয়া গেলে নন্দক ও চন্দনীকে লইয়া বাহির হইয়া আসিব, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঐ লোকটি যায় কিনা দেখিবার জন্য ভবভূতি ও দেবদত্তকে পথের ধারে লুকাইয়া রাখিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে শিকল ও ঝুড়ির সাহায্যে চন্দনীকে ভোজনোপযোগী ফল পাঠাইবার জন্য পাহাড়ে যাইতে হইত। আমাদের সঙ্গে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল, ঝুড়ির সঙ্গে আমি আমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন পাঠাইতাম এবং সে ফলের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন ফেরত দিত। সে যাহা হউক অনেক দিন পরে ঐ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিটি বাহির হইয়া গেল। এত দিন সে ঐরূপ নির্জ্জন স্থানে সে কি কার্য্য সাধন করিল, তাহা বুঝিলাম না। আমি তখন কালবিলম্ব না করিয়া ভবভূতি ও দেবদত্তকে লইয়া সাবধানে পাহাড় হইতে বালির নীচে পড়িলাম। সেখানে কেবল একা চন্দনীকে দেখিলাম। কিন্তু চন্দনী আমাকে নন্দক সম্বন্ধে সমুদায় কথাই কহিল। কালবিলম্ব না করিয়া আমি চন্দনী, ভবভূতি ও দেবদত্তকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলাম। সেখানে নন্দককে পাইলাম। দেখিলাম, নন্দক পথ ঠিক করিতে না পারিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে আমার পরিচয় দিলাম। ভ্রাতা ভগ্নীতে আলাপ হইল। তারপর সে আমাকে অচেতন করিবার মাদকের বিষয় সমস্ত জানাইল। প্রকারান্তরে তাহাকে যে বন্দী করা হইয়াছে তাহাও সে কহিল। আমিও তাহাকে আমার অতীত জীবনের সমুদায় ঘটনা জানাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে তখনও তোকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিল না। সে আমাকে স্পষ্ট কহিল "মা আমার বিশ্বাস, তুমি চণ্ডদেবের বিষয়ে ভুল বুঝিয়াছ।"

সে যাহা হউক, আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আমি যে মরি নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও ছলনাপূর্ব্বক তোর কল্পনা অসিদ্ধ করিয়াছেন, এই সংবাদ তোকে জানাইবার জন্য আমি এতই ব্যস্ত হইলাম যে, নন্দকের অজ্ঞাতেই এই দেখ তোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" এই কথার পরই বক্তা নীরব হইলেন। চণ্ডদেব "নন্দক! নন্দক! আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা কর, শত্রু আমার শিয়রে" বলিয়া বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"ভয় নাই, ভয় নাই, এই আমি আপনার রক্ষার জন্য আসিয়াছি, কৈ শত্রু? কে শত্রু? কোথায় শত্রু"? এই কথা বলিতে বলিতে উন্মুক্ত তরবারি উচ্চ করিয়া নন্দক তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাস।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণে নবকিশোর বাবু গঙ্গার সোপানের উপরে বসিয়া অন্যমনে চাহিয়াছিলেন। সেই গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে কত ঢেউ যে তাঁহার এপাশ ওপাশ দিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন। আর তিনি দেখিতেছিলেন যে, এইমাত্র ধরণী রৌদ্র বুকে ধরিয়া হাসিতেছিল, ক্রমে ক্রমে সেই রৌদ্র পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়া গাছে উঠিল এবং ক্রমে গাছের অগ্রভাগে তাহার একটুমাত্র অবশিষ্ট রহিল। আকুলা ধরণী যেন বৃক্ষরূপে শ্যাম হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া সেই কিরণটুকু ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। হায়! এটুকুও বুঝি আর তাহার থাকে না। যাহা মনে ভাবিতে ভয় করিতেছে, সেই আঁধারের বিরাটমূর্ত্তি বুঝি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। নবকিশোর বাবু ভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

পিছন হইতে নীরজা ডাকিল "দাদা বাবু!" নবকিশোর হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিকটে বসাইলেন। নীরজা বলিল "দাদা বাবু!" তিনি বলিলেন "কি দিদি?"

"তুমি সে দিন বারণ করে দিয়েছিলে, তবুও আবার দাদা পাখী মেরেছে। একটী শালিক পাখী মেরেছে" এই বলিতে বলিতে নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। নবকিশোর বাবু আশ্চর্য্য ও একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বটে, কথা শোনেনি, এবার ভাল করে শাসন করে দিব, কাঁদিস্‌নে

দিদি।" নীরজা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলিল "আমি বল্লুম দাদা মেরনা, মেরনা", তাহাতে দাদা হেসে বল্লে "বা না মারলে বুঝি হাতের ঠিক্ হয়? আমি অমন কত পাখী মারি, বাবা আমাকে মার্‌তে বলেন, দাদা বাবুর কথা আমি শুন্‌ব না।" নবকিশোর বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। নীরজা বলিল "দাদা এই কদিন মোটে এসেছে, তার মধ্যে কত পাখী মার্‌লে, দাদাবাবু তুমি বারণ করে দিও।" নবকিশোর বাবু ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন "সে আর আমার কথা শুন্‌বে না দিদি।" নীরজা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন?"

"তার বাপ মার্‌তে বলে দিয়েছে। বাপের কথা কি অমান্য কর্‌তে আছে।"

দুই জনে কিছুক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নীরজা সহসা বলিল "দাদা বাবু, গঙ্গার একটা ঢেউও দাঁড়ায় না, কোথায় যায়?"

নবকিশোর বাবু বলিলেন "কি জানি দিদি, তাই ভাব্‌ছি কোথায় যায়?" নীরজা দাদাবাবুর কণ্ঠস্বরে অন্য রকম ভাব বুঝিয়া কথাটা উল্টাইয়া ফেলিল। শৈশব হইতে সে কথা উল্টাইতে শিখিয়াছে। বালিকাসুলভ কৌতূহলের বশে সে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলিত যে, তাহাতে তাহার দাদাবাবুর মুখ মসিময় করিয়া দিত। অমনি নীরজা বুঝিত যে,সে কি বলিতে কি বলিয়াছে,তখনি হাসিয়া আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দাদাবাবুর মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। আজও হাসিয়া বলিল "দাদাবাবু পড়া নেবে না?"

নবকিশোর বাবু—"আজ থাক্ দিদি।"

নীরজা—"তবে বেশ ভাল দেখে একটা গল্প বল।"

নবকিশোর বাবু গল্পের অবতারণা করিবামাত্র নীরজা বলিল "একটু দাঁড়াও, দাদাকে ডেকে আনি"। সুরেন্দ্রকে লইয়া তখনি নীরজা আসিয়া উপস্থিত হইল। নবকিশোর বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

সেই অন্ধ মুনির কথা। বালক সিন্ধু কেমন করিয়া প্রত্যহ অন্ধ পিতাকে লইয়া বনে বনে বেড়াইয়া বেড়াইত। শৈল-খণ্ডে নির্ঝরের কাছে বসিয়া পিতার পদ-সেবা করিত, বল্কল দিয়া বাতাস করিত, বনে বনে ফল খুঁজিয়া বেড়াইত। তার পরে একদিন সন্ধ্যার পর নদীতটে কলসীতে জল ভরিতে ভরিতে এক অদৃশ্য হস্তের শর আসিয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। বালক লুটাইয়া পড়িল। ভীত দশরথ রাজা সেই মৃত দেহ লইয়া অন্ধ মুনির নিকট চলিলেন। অন্ধ মুনি প্রতি পদ-শব্দে ভাবিতেছিলেন "এই বুঝি আমার সিন্ধু আসিতেছে"। হা অদৃষ্ট, সিন্ধু তৃষ্ণার্ত্ত পিতার জন্য জল আনিতে গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ দশরথ রাজা অন্ধ মুনির ক্রোড়ে দিলেন। সহসা নবকিশোর বাবু বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরজা স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। বিমলা চরণ আসিয়াছেন। নবকিশোর বলিলেন

"এইখানে আসিতে বল।" ভৃত্যের প্রস্থানের পরই বিমলাচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেই আরম্ভ করিল "আমার শরীর খারাপ; সেখানে একা থাকিতে অসুবিধা হয়, কল্য ইহাদের লইয়া যাইব।" নবকিশোর শুনিতে লাগিলেন। "আপনি বোধ হয় ইহাতে আপত্তি করিবেন না।" নবকিশোর বাবু তথাপি উত্তর দিলেন না। "তবে কল্য ইহাদের প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিবেন, কল্য দুইটার সময় লইয়া যাইব।" বিমলাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহসা নবকিশোর গমনোন্মুখ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন "একটী কথা।" বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

নবকিশোরবাবু—নীরজাকে আমায় দিয়ে যেও।

বিমলাচরণ—ইহা একেবারে অসম্ভব। আপনি তাহার যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আর না।

বিমলাচরণ চলিয়া গেল। নীরজা দুই হস্তে নবকিশোরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল "আমি যেতে পারব না, দাদাবাবু, দাদাবাবু, আমায় যেতে দিও না।" নবকিশোর কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যাবে বই কি দিদি; বাপের মনে কি কষ্ট দিতে আছে, আবার আসবে।"

নীরজার মাতা ডাকিলেন, নীরজা চলিয়া গেল। নবকিশোর বাবু সেই অন্ধ মুনির কথা ভাবিতে ছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে সহসা মনশ্চক্ষুতে যেন দেখিলেন তেমনি একখানা মৃত শুভ্রমুখ তাঁহার কোলের উপর পড়িয়া আছে, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতবক্ষে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভগবান্, আমি মরি ক্ষতি নাই, বিমলাচরণকে যেন অভিশাপ স্পর্শ না করে, নীরজার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

কল্য আসিল, জিনিষ পত্র শকটে উঠান হইল। বিমলাচরণ পিতার পদ বন্দনা করিয়া শকটে উঠিয়া বসিল। সুরেন্দ্র নবকিশোরকে প্রণাম করিল, নবকিশোর তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে বালক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া শকটে আরোহণ করিল। নীরজা, অশ্রুপূর্ণনেত্রে দাদাবাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন তাহার মাতা শ্বশুরের পদধূলি ও সহস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া গাড়ীতে উঠিল, তখন বুঝিল এইবার তাহার পালা। নীরজা কম্পিতবুকে দাদাবাবুর হাতখানি দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল, যেন এই স্নেহময় হস্ত হইতে কেহ তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। নীরজার মাতা গিরিবালা দেবী একবার অস্ফুটকণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন, "নীরোকে আর কিছু দিন শ্বশুরের কাছে রাখ্‌লে না কেন? আহা উনি একা কি করে থাক্‌বেন?" বিমলাচরণ কটমট চক্ষে চাহিলেন, সভয়ে গিরিবালা চুপ করিল।

নবকিশোর চারি দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সকলে নীরজার অপেক্ষা

করিতেছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "দিদি গাড়ীতে উঠ।"

নীরজা নড়িল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নবকিশোর অসীম ধৈর্য্যবলে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ছি দিদি, কাঁদ্‌তে নেই, বাপের সঙ্গে যাবে তাতে কান্না কি? আবার আস্‌বে, এখন যাও, বাপের কথা অমান্য করে কি?"

"দাদাবাবু, কবে আবার আস্‌ব?

এইবার নবকিশোরের বাঁধ আর থাকিল না, কম্পিতহস্ত তাহার মাথায় রাখিয়া বলিলেন. "স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুখী হইও, ভগবানে বিশ্বাস রেখো।" নবকিশোর বাবু ছুটিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"দাদবাবু, দাদাবাবু, আবার কবে আস্‌বে?" গাড়ী চলিয়া গেল।

প্রায় একমাস হইল নীরজা চলিয়া গিয়াছে, নবকিশোর বাবু এখনও অপরাহ্ণে গঙ্গার সোপানে বসিয়া থাকেন। সূর্য্যের কিরণটুকু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, নদীর ঢেউগুলা একভাবে বহিয়া যায়, ক্রমে ক্রমে বিরাট আঁধার আসিয়া জল স্থল সব এক করিয়া দেয়। গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া নবকিশোর শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। যে দু এক ফোঁটা জল কপাল বহিয়া উপাধানে আসিয়া পড়ে, তাহা অশ্রুবিন্দু নহে, হৃদয়ের রক্তবিন্দু।

প্রভাতে ফটকে আসিয়া দাঁড়ান, প্রভাতের নব কল্লোল ডুবাইয়া চারিদিকে বাজিতে থাকে, "দাদাবাবু আবার কবে আস্‌বে।" নবকিশোর বাবু আবার অন্তঃপুরে চলিয়া যান।

বিমলাচরণের পত্রের উত্তর দেন নাই, তাই বিমলাচরণও আর তাঁহাকে পত্র দেয় নাই। বিমলাচরণের পত্রখানি লইয়া দিনের মধ্যে সাত আট বার পাঠ করেন, "আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি ও ভাল আছি, আপনি কেমন থাকেন লিখিবেন, প্রণাম ইতি।" বিমলাচরণ পত্রে নীরজা বা সুরেন্দ্রের নামও করেন নাই।

পত্রপাঠকালে বড় বড় ক'ফোঁটা অশ্রু ক্ষুদ্র কাগজখানি সিক্ত করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া নীরজার প্রথম প্রথম কয়েক মাস বড় কষ্টে কাটিয়াছে। আসিবার পর বহুজনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ নগরী তাহার নিকটে সব ধূমের মত বোধ হইত। দশমবর্ষীয়া বালিকা নীরজার মনে হইল যে, দাদাবাবু তাহার পর, তাই জন্মাবধি যে স্নেহ-অঙ্কে পালিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চক্ষুর জলে চারি দিক অন্ধকার দেখিত। মাতার আদর, পিতার স্নেহময় বাক্য, ভ্রাতার কৌতুকালাপ, কিছুতেই তাহার মুখে হাসি আনিতে পারিত না।

মাতার কোলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "মা আমি দাদাবাবুর কাছে যাব"। মাতা কত বুঝাইতেন, পুতুল, খাবার, গহনা কত কিনিয়া দিতেন। পিতা বিমলাচরণ নীরজাকে লইয়া ইডেন গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম্, ফোর্ট

থিয়েটর, প্রভৃতি দেখাইতেন, কত ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া দিতেন, কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না। ক্রমে ক্রমে নীরজা প্রকৃতিস্থা হইতে লাগিল। হাসিয়া মাতার সহিত গল্প করিত, মাতার কাছে আব্দার করিত, পিতার কাছে বসিয়া কত সুন্দর জিনিষের বর্ণনা করিত। কন্যাকে ক্রমশঃ সুস্থা দেখিয়া পিতা মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তবু এক এক বার দাদাবাবুর সেই স্নেহময় কথা, সেই স্নেহপূর্ণ মুখ মনে করিয়া তাহার কান্না আসিত; আবার বাল-সুলভ ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ পরেই ভুলিয়া যাইত। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সে দাদাবাবুকে বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিল। তাহার কোনই উত্তর পায় নাই, আবার লিখিয়াছিল, তাহারও উত্তর পায় নাই। তখন বড় অভিমানে নীরজা দুদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, ক্রমে আবার ভুলিয়া গেল। নীরজা লিখিতে জানিত না, সুধু দাদাবাবু লিখিলেই পত্র যায় না, কাজেই নবকিশোর বাবু সে পত্র পান নাই। তিনি শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া নীরজাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নীরজা কাঁদিবে বলিয়া বিমলাচরণ সে পত্র তাহাকে দেয় নাই। নবকিশোর বাবুও তাহা বুঝিয়া আর পত্র লিখেন নাই।

কয়েক দিন পরে নীরজা দেখিল যে, সে তাহার পূর্ব্বের মত খাদ্য এখন খায় না। তখন সে সর্ব্বদা কাঁদিত, মাতা যাহা খাওয়াইয়া দিতেন, তাহাই খাইত। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিল যে, এ সব সে পূর্ব্বে কখনও খায় নাই। মাছ, মাংস খাইতে প্রথমে তাহার বড় ঘৃণা করিত, তাহার দাদাবাবু তো এসব কিছুই খাইতেন না বা তাহাকে খাওয়াইতেন না। খাইতে আপত্তি করিলে মাতা রাগ করিতেন, পিতা তিরস্কারের ভাবে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমরা খাই, তোর খেতে দোষ কি?" অগত্যা নীরজা খাইল। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেল। এত গহনা, পোষাক, জামা, গন্ধদ্রব্য, জুতা, মোজা তাহার জ্ঞানে সে পরে নাই, সব প্রথমে পরিতে তত ভাল লাগিত না, শেষে আর সে বিরক্তিটুকু রহিল না। সরলা নীরজা সিল্কের গাউন জুতা, মোজা, ইয়ারিং পরিয়া ক্ষুদ্র মস্তকের বেণীটি দোলাইয়া ভ্রাতার সহিত গড়ের মাঠে কত ছুটাছুটী ও খেলা করিত পিতা স্নেহপূর্ণনেত্রে তাহা দেখিতেন। সন্ধ্যার পরে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোক-সজ্জিত কক্ষে ভ্রাতার সহিত চেয়ারে বসিয়া শিক্ষকের নিকটে ইংরাজী, সংস্কৃত শিক্ষা করিত। প্রাতে পিতা ও ভ্রাতার সহিত চা খাইয়া বেড়াইতে যাইত। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, কেমন রাস্তা, কত লোক জন, কত গাড়ী ঘোড়া দেখিত। পরে আসিয়া আবার পড়িতে বসিত। আহারের সময় পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত একত্র আহার করিত। তবুও একবার দাদাবাবুর সেই স্নেহময় মুখখানা দিনান্তে মনের মধ্যে উঁকি

মারিয়া যাইতে ছাড়িত না। এমনি করিয়া আনন্দে, খেলায়, স্নেহের মধ্যে কখনও বা এক ফোঁটা অশ্রুজলে নীরজার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিমলাচরণ এখন একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। খুব পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। মতে যদিও ব্রাহ্ম, তথাপি এখনো সার্টের নীচে পৈতাটি লুকাইয়া পরিতেন। তবে তাহাতে কিছু আটকায় না। বিমলাচরণ বাবু সমাজে যান না বটে, তথাপি তিনি যে একজন প্রকৃত শিক্ষিত, নব্য সংস্কারপ্রিয় ও সুসভ্য, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না। স্ত্রী গিরিবালা প্রথমে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সাক্ষাতে বাহির হইতে, সভ্য সাজে চলাফেরা করিতে বড় মুস্কিলে পড়িত, কিন্তু স্বামীর ভয়ে তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পালন করিত। তাই বিধবা কন্যাকে মাছ মাংস খাওয়ানতে স্বামীর কথার কোন প্রতিবাদও করিতে সাহস করে নাই। ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

নীরজা এখন বেথুন স্কুলে অধ্যয়ন করে। বাড়ীতেও শিক্ষক আছে, ও তাহার ভ্রাতা সুরেন্দ্র এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠিয়াছে। সমবেত বন্ধু বান্ধবগণ যখন দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা নীরজা ও চতুর্দ্দশবর্ষীয় সুরেন্দ্রের গুণের, সরলতার, শিক্ষার, সৌকুমার্য্যের একবাক্যে প্রশংসা করেন, তখন বিমলাচরণের বুকখানা সাত হাত ফুলিয়া উঠে। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে আদর্শ পিতা বলেন, তখন তিনি সগর্ব্বে গম্ভীর মুখে বলেন, এখনও তাহার পরীক্ষার দিন আসে নাই, সে দিন উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে বুঝিব আমি পিতৃনামের যোগ্য।

নীরজার এখন আর কোনও কষ্ট নাই। তাহার সুন্দর সরল মুখখানি ও তরুণ দেহটী এখন নব সৌন্দর্য্যে পুরিয়া উঠিতেছে। সে এখন প্রত্যহ গাড়ী করিয়া গাউন পরিয়া পৃষ্ঠে সুচিক্কণ বেণী ফেলিয়া স্কুলে যায়। সেখানে শিক্ষয়িত্রীগণ তাহার নম্রতা, সরলতা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহাকে কত ভাল বাসেন। গাড়ী করিয়া বৈকালে বাড়ী আসিবার সময় সে একটা গলির মধ্য দিয়া আসে। সে দেখিয়াছিল যে, সেই গলিতে ছিন্নবস্ত্র কয়েকটী ভিখারী আঁচল পাতিয়া বসিয়া থাকে। পথের পার্শ্বে কোচম্যানকে গাড়ী দাঁড় করাইতে বলিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করে। পরদুঃখকাতরা বালিকার চক্ষুতে কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হয়। নীরজার পূর্ব্বের মত এখন কিছুই নাই, তবু যে উষার করে প্রথম কলিকা জীবনটী ফুটিয়াছিল, সে আলো প্রাণের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গিয়াছে, তাই সহস্র সুখে লালিতা বালিকা দুঃখের ছবি দেখিলে কাঁদিয়া উঠে। দরিদ্রের কষ্টের কথা শুনিয়া সুগন্ধি রুমালে চোখ মুছিয়া ব্যথিতা বালিকা তাহাদের হাতে অর্থ গুঁজিয়া দিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলে, "তোমরা রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থেক।" তারপর গাড়ী ছুটাইয়া বালিকা চলিয়া যায়। পরদিন বৈকালে আসিয়া

সেই দরিদ্রেরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, কখন একখানা প্রকাণ্ড কালো জুড়ীগাড়ীর মধ্য হইতে একখানি শুভ্র কোমল মুখ, আঁধারের বুকে শুভ্র উষার ন্যায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবে। কখন একটী মধুর কণ্ঠস্বর তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণীযুক্ত ক্ষুদ্র একটী মস্তক, সুন্দর একখানি মুখ, করুণাপূর্ণ সুন্দর নয়ন, ক্ষুদ্র সুঠাম দেহ বাহির হইয়া তাহাদের হস্তে প্রার্থিত অর্থ গুঁজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া, মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইবে। নীরজার প্রত্যহ এই কার্য্য ছিল। তাহার পিতা তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য যে সমস্ত অর্থ দিতেন, সে এইরূপে ব্যয় করিত। তাহার পিতা ইহার কিছুই জানিতেন না।

বৈকালে গিরিবালা বলিল, "নিরো! আজ রাত্রিতে এখানে অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, মাথাটা একটু ভালো মেলো হয়ে গিয়েছে ভাল করিয়া নে, আর সেই ফিরোজা রঙের কাপড়খানা পর।" নীরজা বলিল, "আজকে এত বাড়ী সাজান হচ্ছে কেন মা?" "জানিস্‌নে, আজ যে তোর জন্মদিন, বাবু তোর জন্যে বাজারে কত জিনিস্ কিন্‌তে গিয়েছেন, আর তুই যে সে দিন পিয়েনো চেয়েছিলি, তাও একটা আন্‌বেন বলে গেছেন।"

নীরজার বড় আনন্দ হইল। সে স্কুলে তাহার শিক্ষয়িত্রীর কাছে বাজনা শিখিয়াছে, তাহার একটি পিয়েনো আসিবে শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। কক্ষে গিয়া কথামত বেশ পরিয়া আসিয়া মাতার নিকটে বসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "মা আমি কোথায় জন্মেছি, সেখানের নাম কি?"

"জানিস্‌নে নাকি? হরিশপুরে, তোর দাদাও সেইখানে হয়েছে।"

নীরজা একটু চম্‌কিয়া বলিল "মা! সেখানে আমাদের বড় একটা বাড়ী আছে না?"

"হাঁ।"

নীরজা মাতার বক্ষে মুখ লুকাইল। মাতা কন্যার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন মুখখানা বড় ম্লান; বলিলেন "কেন মা?" নীরজা ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "তিনি আমাকে বড় ভাল বাসতেন না?" গিরিবালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন। "বাসতেন বই কি?" নীরজা আবার মুখ লুকাইল।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বর-তত্ত্ব।

ঈশ্বরোপাসনা মানবের জীবন, কিন্তু উপাস্ত দেবতার তত্ত্ব স্বরূপতঃ না জানিলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। উপাস্ত দেবতাকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিয়া ও তাঁহার

সহিত আমাদের প্রাণের নিরন্তর সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাঁহার সহিত যোগে লয় হওয়াই প্রকৃত উপাসনা। শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ উপাসনা নহে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আরাধ্য দেবতাকে বিশেষরূপে আত্মস্থ না করিয়া আমরা সচরাচর যে উপাসনা করি, তাহা অনেক স্থলে মৌখিক উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্য আমাদের উপাসনা আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না। তাহাতেই আমাদের দাম্ভিকতা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধির লোপ হয় না। উপাস্য দেবতার সহিত আমাদের যোগ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, যত আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ আশ্রিত ও অনন্যোপায় বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিব, ততই আমরা দিন দিন তাঁহার নিকটস্থ হইয়া নিজ নিজ আত্মার, নিজ নিজ পরিবারের, আত্মীয় স্বজন ও প্রতি-বেশিগণের, সমাজের, ও দেশের এবং সমগ্র জগতের আশানুরূপ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইব। পরমাত্মা কিরূপ, কোথায় ও কি প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহার কার্য্য ও পরিচয় কি, তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা হয় এবং তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে পারিলে কি ফল-লাভ হয়, এই সকল তত্ত্ব অবগত না হইলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। আলোচ্য বিষয়টি অতিশয় জটিল ও কঠিন, ইহার উপযুক্ত বিচার আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি ইহার কথঞ্চিৎ আলোচনাতেও বিশেষ কল্যাণকর ফললাভের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া ইহার অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, তিনি সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থায় আমাদের অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছেন। যে কার্য্যটি যখন যেখানে সম্পন্ন হয়, যে ঘটনাটি যখন যেখানে সংঘটিত হয়, সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়। তিনি জীবন্ত ও জাগ্রত ভাবে সকল সময়ে ও সকল স্থানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি সকল সত্তার মূল সত্তা, তিনি সকল শক্তির আত্মা শক্তি, তিনি সকল প্রাণীর প্রাণ, সকল চেতনের চৈতন্য, সকল জ্ঞানীর জ্ঞান, সকল প্রেমিকের প্রেম এবং সকল সাধুর সাধুতা। আমরা উপাসনার সময়ে উল্লিখিত ভাবে তাঁহার ধ্যান করি বটে, কিন্তু আমাদের কার্য্য দেখিয়া এই সকল কথা আমাদের প্রাণের কথা বলিয়া বোধ হয় না। যদি ঈশ্বর সকল শক্তির শক্তি হইলেন, তবে কোন দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমরা আত্মশ্লাঘা করি কেন? যদি তিনি সকল জ্ঞানীর জ্ঞান হইলেন, তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য এত গর্ব্বিত হই কেন? যদি সকল সাধুতাই তাঁহার প্রসাদ, তবে আমরা সামান্য সাধু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তজ্জন্য এত অহঙ্কার করি কেন? যদি তিনি আমাদের প্রভু হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তবে আমরা অন্যায় করিতে সাহসী হই কেন? গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারি নাই, কেবল অভ্রান্ত বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার আরাধনা করি। এই জন্যই আমাদের উপাসনা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(১) পরমাত্মা কিরূপ?—তিনি নিত্য সত্য, সকল সত্তার সত্তা, সকল শক্তির শক্তি, সকল প্রাণীর প্রাণ, আত্মার আত্মা ও চৈতন্যের চৈতন্য। তিনি আনন্দ-শান্তি-অমৃতময়, তিনি সর্ব্বমঙ্গল-নিধান, দয়াময়, প্রেমময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ ও পবিত্র। তিনি নির্ম্মল, শরীরবিহীন, ব্রণ ও শিরারহিত, তিনি শুদ্ধ ও দোষ পাপের অতীত, তিনি সর্ব্বদর্শী ও মনের নিয়ন্তা, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ। পরমাত্মা সকল সময়ে সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক পীড়া ও যন্ত্রণা এবং মানসিক শোক সন্তাপাদি কিছুই নাই। জগতের সমুদায় বিচিত্র রচনাকৌশল তাঁহারই এবং সকল কবির কবিত্ব তাঁহা হইতে, তিনি মানবের জ্ঞান ও আত্মার উন্নতি বিধান করেন। তিনি সকল রাজার উপর রাজা। তিনি সকলের স্রষ্টা ও পাতা, কিন্তু তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই। পরমাত্মা অবিনাশী, তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব ও দীর্ঘ, কিছুই নহেন, তাঁহার কোন বর্ণ নাই, তিনি কোন জলীয়, বা বায়বীয় বস্তু, কিম্বা ছায়া নহেন, তিনি অন্ধ, রস ও গন্ধ-রহিত, তিনি চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, মন, তেজ, শারীরিক প্রাণ ও মুখ বিহীন। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, মুখ, হস্ত ও পদ। তিনি সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বব্যাপী, সব কার্য্যেই তাঁহার হস্ত। তিনি জন্ম ও মৃত্যু রহিত মহান্ আত্মা, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। তাঁহার হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই। তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। তিনি আমাদের বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয়ের শক্তি হইয়া রহিয়াছেন। তিনি রসস্বরূপ, সকল আনন্দ ও তৃপ্তির একমাত্র কারণ। তিনি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে এবং সকলের নিকট সমভাবে রহিয়াছেন।

(২) পরমাত্মা কোথায় থাকেন ও কি প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যায়? তিনি দূরেও আছেন, তিনি নিকটেও আছেন, তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে আছেন। কোন সুদূর স্বর্গে থাকিয়া তিনি জগতের কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করেন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ও আমাদের সহায় ও নেতা হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করাইতেছেন। তিনি যে কেবল উপাসনা-স্থলে উপাসনার সময় আমাদের নিকট থাকেন তাহা নহে, কিন্তু সকল স্থানে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছেন। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, কার্য্যকালে, অবসরসময়ে, সকল কালে ও সকল

স্থানেই তিনি আমাদের নিকট বর্ত্তমান। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে যখন যে স্থানে যে অবস্থায় থাকি, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। নির্জ্জনে, সজনে, গৃহে, কার্য্য-ক্ষেত্রে, প্রতিকূল অপ্রতিকূল স্থানে অন্তরতর অন্তরতম আরাধ্য দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। যে ব্যক্তি আপনার আত্মাকে বিশেষরূপে জানেন, তিনি আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষমধ্যেই সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই সর্ব্বাবয়ব-বর্জ্জিত পরব্রহ্মের উপলব্ধি করেন। তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্ত শুদ্ধ ও সংশয়-রহিত হয়, তখন তাঁহাকে নিজ আত্মাতে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করা যায়। একাগ্র-চিত্ত হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা কর, একান্তমনে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

(৩) পরমাত্মার কার্য্য ও পরিচয় কি? তাঁহার কোন কার্য্য বা কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয় নাই এবং তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তাঁহার শক্তি বিচিত্র এবং তাঁহার জ্ঞানবল ক্রিয়া স্বাভাবিক। পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা, তিনি সকল লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সৃজন, পালন, লয়, তাঁহারই কার্য্য। তিনি প্রত্যেক নর-নারীর নেতা, নিয়ন্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাঁহারই আদেশে ও নিয়মে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। তিনি সকল উদ্ভিদ ও জীবের সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতেছেন। তিনি জগতের সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি করিতেছেন। তিনি সকল অবস্থায় আমাদের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

(৪) তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তিনি আমাদের পিতা, মাতা, গুরু ও প্রভু। তিনি আমাদের পরম আত্মীয়, পরম সুহৃৎ। তিনি আমাদের গৃহদেবতা হইয়া আমাদের গৃহের সকল ভার লইয়া আছেন। তিনি আমাদের পরম আশ্রয়, পরম সহায় ও একমাত্র অবলম্বন। তিনি আমাদের গতি, মুক্তিদাতা, পরি-ত্রাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তিনি আমাদের নেতা ও পরিচালক।

(৫) কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা হয়? তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য করাই তাঁহার উপাসনা। চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল বসিলেই যে তাঁহার উপাসনা হয় তাহা নহে, তাঁহাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া একাগ্র-চিত্তে তাঁহার স্বরূপ ধ্যান ও আপনাকে দুর্ব্বল ও হীন জানিয়া জীবনে কেবল তাঁহারই কৃপা দর্শন করিয়াও আত্মোন্নতির

ভক্ত সর্ব্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই প্রকৃত উপাসনা।

(৫) পরব্রহ্মকে আত্মস্থ করিতে পারিলে কি লাভ হয়? যখন উপাসক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, আধাররহিত পরব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া নির্ভয়ে তাঁহাতে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। তাঁহার আনন্দ আস্বাদন করিলে কোন ভয় থাকে না। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া উপাসক এই লোক হইতে লোকান্তরে গিয়া অমর হন। যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারা নিত্য আনন্দ ও নিত্য শান্তির অধিকারী হইয়া সুখী হন এবং সংসারে তাঁহাদের কোন রূপ ভয় ভাবনা থাকে না। তাঁহারা কাহারও বিরুদ্ধচারী না হইয়া সকলের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন। এই ভগবত্তত্ত্ব আলোচনায় আমাদের ইহ পরকালের কল্যাণ হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি স্বপ্রকাশ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হউন, আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হই।

ঐতিহাসিক ঘেঁটু পূজা।

হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ। স্মৃতির ব্যবস্থা লইয়া এই সকল পর্ব্ব, বার, ব্রত, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের নিমিত্ত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। কালবিভাগ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত। ভারতের প্রদেশভেদে কোন কোন বার, ব্রত ও পূজার পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কত সংখ্যক ব্রতপর্ব্বাদি যে বার মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আবার দেশভেদে এই সমস্ত পার্ব্বণ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উহাদের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির ব্যবস্থা সৌর দিনে, কতকগুলির চান্দ্র দিনে নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতাদি ব্যতীত আরও অনেকগুলি প্রচলিত ব্রতাদি দৃষ্ট হয়। যে প্রাচীন প্রথাগুলি বঙ্গের সমাজতরুকে লতিকার ন্যায় দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার ও দীক্ষার প্রভাবে সে গুলি ক্রমে দূর হইয়া যাইতেছে। যে সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বার ব্রতের ছড়ার মধুর আবৃত্তিধ্বনিতে বঙ্গের পল্লীগ্রামগুলির নিভৃত কুটীরপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত, যাহার উৎসাহে পল্লীর বালিকা ও বয়স্কা গৃহিণীগণ একদিন প্রভূত আমোদ উপভোগ করিতেন, এখন তাহা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। কিন্তু সেগুলিকে দূরীভূত করিয়া আমরা কখনই

আনন্দ লাভ করিতে পারিব না। একে একে বঙ্গের যাবতীয় পবিত্র আনন্দ স্রোত লয় পাইতেছে, এবং সে সকলে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা কেবল দুর্বিষহ সংসার-যাতনায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কালাতিপাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতও হইতেছি না। আমাদের নব্য ভগিনীগণের মধ্যে এ সকলের পক্ষপাতী কয়জন, তাহা অবগত নহি; তবে যেরূপ কালের রীতি দেখিতেছি, তাহাতে ইহা যে আর বেশী দিন বঙ্গের ব্রতকথা বলিয়া স্থানাধিকার করিতে সক্ষম হইবে, এমন বোধ হয় না। কেননা অগ্নির মূর্ত্তি দেখিলেই বোধ হয় উহা কখন না প্রলয় কাণ্ড ঘটায়। যাহা হউক, যদি যাস্তবিক এগুলির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যায় যে, রমণীগণের ব্রতাদির অধিকাংশই পৌরাণিক ভিত্তির উপর স্থাপিত দণ্ডায়মান। এই বিষয় লইয়া আমি গত বৎসর 'ভারত মহিলা' নামক মাসিক পত্রে সম্যক্ আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম এবং সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট তজ্জন্য বিশেষ ঋণী আছি, সন্দেহ নাই। উপস্থিত প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধান্তর্গত বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সমস্ত ব্রতের অধিকাংশই মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ হয়। এই সমস্ত ব্রতে স্তরে স্তরে দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, তপস্যা, মুক্তি, সাধুতা, বিনয়, উন্নতি, উৎসাহ প্রভৃতি উপদেশ যেন অক্ষয়াধারে গ্রথিত রহিয়াছে। আনন্দের বিষয় আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক জনের এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে আগ্রহ জন্মিয়াছে। অস্মদ্দেশে নিম্নলিখিত ব্রত সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হয়ত অন্যান্য দেশে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি যে, এই ব্রতাদি আমাদের দেশে (নদীয়া জিলায়) নিম্নলিখিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈশাখে—

গোকুল, দশপুত্তলিকা, পুণ্যপুকুর, শিবব্রত, ধনগছান (দুই প্রকার), আগণা, যাচাপান, ফলদান, ষোলকলা, কলাছড়া, একফল, ঘৃত-সংক্রান্তি, মধুসংক্রান্তি, দর্পণ-সংক্রান্তি, অক্ষয় ফল, অক্ষয় জল, পদ্ম পূর্ণিমা, চন্দন ব্রত, কলাপূর্ণিমা, অশ্বত্থ পাতা, দধি-সংক্রান্তি, ক্ষীর সংক্রান্তি, ছাতু ও ঘৃত সংক্রান্তি, অন্নদান, জলদান, ত্রিপুষ্কাদশী, জলষষ্ঠাদশী।

জ্যৈষ্ঠে—

জামাইষষ্ঠী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, চাঁপাচন্দন, পঞ্চমী, রম্ভা তৃতীয়া।

আষাঢ়ে—

শাকসোঁলা, হাঁড়িধোয়া, চিড়ের অরন্ধন, তালের অরন্ধন, গুরু-পূর্ণিমা, গোপদ্মব্রত, কোকিলা ব্রত।

শ্রাবণে—

সংক্রান্তি, বনভোজন, চড়চড়ি অরন্ধন।

ভাদ্রে—

চর্পটা ষষ্ঠী, অরন্ধন, মহালক্ষ্মীপূজা, তালনবমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্তব্রত, সাবিত্রী-ব্রত, ললিতা সপ্তমী।

আশ্বিনে—

কোজাগরী, ডাক সংক্রান্তি।

অগ্রহায়ণে—

কুলুইচণ্ডী, পাটাইষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী।

পৌষে—

লোটনষষ্ঠী, পিষ্টক সংক্রান্তি, পৌষ আগলান, বাউনীবন্ধন, তুষতুষালি।

ফাল্গুনে—ঘেঁটুপূজা।

চৈত্রে—নখছুটী।

উপরি-উক্ত তালিকার মধ্যে কয়েকটী উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ব্রতাদি প্রচলিত আছে। রমণীসুলভ ব্রতকথাগুলি যে ভাষায় গ্রথিত ও মুখে মুখে বংশপরম্পরায় বাঙ্গালি পরিবারে চলিয়া আসিতেছে, তাহা অনাদর বশতঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের একটি আলোচনার সামগ্রী। তথাপি অনেকে এ বিষয়ে বড় একটা যত্ন করেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা যে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ এবং ইহার অনুসরণ করা যে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

যাক সে কথা। বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তবে বাঙ্গালীসুলভ চপলতা বশতঃ এক কথা বলিতে সাত কথা না বলিয়া আরম্ভ করা যায় না। এ'টা শুধু যে আমাদের দোষ তাহা নহে, বরং কবিদের এই ভাগটা বেশী। তা' দোষই হ'ক, আর গুণই হ'ক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে যেমন বঙ্গদেশীয় বালিকারা ইতুদেবী ও তুষালী দেবীর পূজা উপলক্ষে উৎসব করিয়া থাকে, তেমনি ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসে উষাকালে বঙ্গদেশীয় প্রবীণামহলে ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণের পূজার আড়ম্বর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইতু বা তুষালী দেবীর যেরূপ সমস্ত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস ধরিয়া পূজা হইয়া থাকে, ঘেঁটুর সেরূপ নহে। ইহার সদ্য আবাহন ও সদ্য বিসর্জ্জন। মুহূর্ত্তকালের জন্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তৎপরে বিসর্জ্জন। এ বিষম্য বড় বিষম, বড় দুষ্কর!

এক্ষণে ফাল্গুন মাসে কেন ঘেঁটুপূজা হয় ও তাহার পূজাপদ্ধতি কিরূপ, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাউক। হিন্দুর সকল ব্রত পার্ব্বণ যে শাস্ত্রজড়িত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঘেঁটুপূজা সম্বন্ধেও শাস্ত্রে আছে,—

"চৈত্রে মাসি চ সংপূজ্যো ঘণ্টাকর্ণো
ঘটাত্মকঃ,
আরোগ্যায়স্মৃহিমূলে সংক্রান্ত্যাং
তত্র কায়য়েৎ।"

ঘেঁটুর পূজাবিধি ও পূজামন্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি বিস্ফোটক অর্থাৎ ব্রণ, ফোড়া, পাঁচড়ার অধিষ্ঠাতা। ঘণ্ট অর্থাৎ গাত্রকণ্ডু আর্কণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়াই ঘেঁটুর নাম 'ঘণ্টাকর্ণ' ('বঙ্গীয়

শব্দসিন্ধু ১৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং সেই জন্যই ঘেঁটুর পূজার ব্যবস্থা।

ধরিতে গেলে শীতকালই খোস পাঁচড়ার দেবতার বিশেষ প্রভুত্বের সময়। পৌষ, মাঘ মাসে বালকবালিকাদের মধ্যে যেরূপ খোস পাঁচড়ার বাড়াবাড়ি, এমন আর কোন মাসে হয় নাই। খোস, পাঁচড়া যে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহা বোধ হয় তিনি ইহ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবেন না। আর বালকবালিকা-দিগের'ত কথাই নাই। তাহারা ইহাকে বড়ই ভয় করিয়া থাকে। শীতকালে শীতের ভয়ে জলের ত্রিসিমানায় যাইতে চাহে না, কাজেই গায়ে ময়লা জমিয়া অব-শেষে তাহা খোস, পাঁচড়ার 'আবাস' হয়। পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস ভুগিয়া ভুগিয়া ফাল্গুন মাসকে দেখিয়া তাহাদের আশঙ্কা কতকটা দূর হয় এবং প্রাণেও কতকটা আশার সঞ্চার হয়। বাস্তবিক ঐ দুই মাসে খোস পাঁচড়ার যেরূপ প্রবল আধিপত্য, এমন আর কোন সময়েই নয়। ফাল্গুন মাসে আর সেরূপ ভাব লক্ষিত হয় না। তখন তাহারা যেন দিন দিন নির্জ্জীব হইতে থাকে। বালকবালিকারাও 'হাঁফ' ছাড়িয়া বাঁচে। তাহাদের বিবাদ-পূর্ণ মুখে হাসির রেখা দেখা যায়। এই সময়ই যাঁহার কৃপায় বিষম বিপদ হইতে তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে, সেই খোস পাঁচ-ড়ার অধিষ্ঠাতার অর্চ্চনার সময়। এই সময়ে তাহারা বর্ষীয়সী পিতামহী বা মাতামহীর সহিত যোগ দেয়। প্রবীণারা ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিনে উষাকালে বাটীর বহির্ভাগে (ইহা 'তে'মাতা রাস্তায় হইলে ভাল হয়) রাস্তার উপর মৃত্তিকার একটি পুরাতন কৃষ্ণবর্ণ খোলা হাঁড়ি 'উপুড়' করিয়া রাখিয়া তাহার উপর গোময়ের চারিটি পিণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক সেই 'ঢেলা' গুলির উপর এক এক কড়া কড়ি বসাইয়া দিয়া তাহাতে সিন্দুর লেপন করেন। তৎপরে সম্মুখে একখানি নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করা হয়। এই সময়ে জঙ্গলে একপ্রকার (অবশ্য গভীর অরণ্যে নহে, পল্লীগ্রামের জঙ্গলে) পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ইহা ঐ দেবতার অর্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়, এজন্য উহাকে 'ঘেঁটুফুল' বলে। ঘেঁটুপূজা এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হইয়া থাকে। ঐটি বড় চমৎকার পূজা। ইহার পদ্ধতি এইরূপ :—

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে বাটীর গৃহিণী বা অপর কোন বয়স্থা মহিলা 'বাসীমুখে, বাসীকাপড়ে একটা ভাঙ্গা কাল হাঁড়ি সদরদ্বারের বাহিরে 'উবুড়' করিয়া পাতিয়া তাহার উপর এক 'ডালা 'গোবর, একটু সিন্দুর, পাঁচ কড়া কাণাকড়ি, কতকগুলি ছেঁড়া চুল রাখেন। অত্যল্প সিদ্ধ চাউল এবং ভাঁটফুল (পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাকে ঘেঁটুফুলও বলে।) দিয়া ঘেঁটু পূজা করিতে হয়। পূজাও বাম হস্তে করিবার নিয়ম। প্রণামের পরিবর্ত্তে বালকেরা এই হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত

করিয়া থাকে। ইহা বোধ হয়, আমাদের গ্রাম্য ভ্রাতাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। তৎপরে সেই ভাঙ্গা হাঁড়ির একটু 'খাপরা' এবং পাঁচকড়া কড়ির সহিত গোবরটুকু পূজাকারিণী গৃহে লইয়া যান। 'খাপরা'র ফালির দ্বারা বালক বালিকা ও শিশুদিগের চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করিয়া গোবর-টুকু দ্বারের উপরের চৌকাঠে লাগাইয়া তাহাতে কড়ি পাঁচ কড়া বসাইয়া দেন। এই'ত গেল ইহার গ্রাম্য সংবাদ, এখন ইহার ঐতিহাসিক কি প্রমাণ আছে দেখা যাউক।

ঘেঁটুপূজার ইতিহাসলেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, মেধার গর্ভজাত মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ্বর অভি-শপ্ত হইয়া, নররূপে উজ্জয়িনী নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের প্রধান পণ্ডিত হইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন। কিন্তু শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, 'মুখে আর শিবনাম উচ্চারণ করিব না, কর্ণে আর শিবনাম শুনিব না'। কিন্তু মুখে বলা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইলেও অপরে বলিলে কর্ণে নিশ্চয় শুনিতে হইবে, সুতরাং তিনি দুই কর্ণে কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলেন। কেহ শিবনাম উচ্চারণ করিতেছে বুঝিলেই মাথা নাড়িতেন এবং ঘণ্টাগুলি বাজিত। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত-দিগকে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কালীদাস ব্যতীত আর সকলেই পরাস্ত হইলেন। এইবার কালিদাসের পালা। তিনি কৌশলে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আপনার সহিত বিচার করিতে পারি যদি আপনি একটী শিবস্তোত্র রচনা করিয়া শুনাইতে পারেন"। তখন ঘণ্টাকর্ণ শিবনাম ব্যতীত এমন চমৎকার একটি স্তোত্র রচনা করিলেন যে, সমস্ত সভাসদ্ চমৎকৃত হইলেন এবং কালিদাস বিনা বিচারে পরাভব স্বীকার করিলেন।

কর্ণে ঘণ্টা বাঁধার জন্য ইঁহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণ' হয় এবং শিবনাম ত্যাগ করায় লোকে তাঁহাকে 'শিব বৈরী' বলিত এবং ঘৃণার সহিত সকল প্রকার চর্ম্মরোগের অধিষ্ঠাতা করিয়া তাঁহার পূজার ব্যপদেশে তাঁহাকে অপমান করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু "তীর্থাদিতত্ত্বে" লিখিত আছে, ইনি মহাদেবের একজন প্রিয় অনুচর। মীন সংক্রান্তিতে স্নুহীবৃক্ষতলে ইঁহার পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথাঃ—

"ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন স্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল।"

পূর্ব্বে ঘেঁটুপূজা এখনকার মত সামান্য ভাবে হইত না। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তারা নানা প্রকার বাদ্য সহ পথে পথে রঙ্গ ভঙ্গের সহিত গীত বাদ্য করিতেন। ফাল্গুন-সংক্রান্তির প্রাতে বড় বড় 'জালা' 'গামলা' প্রভৃতির দ্বারা আড়ম্বর ও রহস্যে পূজা সমাপ্ত হইত। প্রণাম অর্থাৎ লগুড়াঘাত সময়ে কে আগে লগুড়াঘাত করিবে, তাহা লইয়া বল পরীক্ষা হইত। যে সকলকে পরাস্ত করিতে পারিত, সেই অগ্রে এই লগুড়া-

ঘাতের অধিকারী হইত। বর্ত্তমান পঞ্জিকা-গুলিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সে দৃশ্যটা কিরূপ এখন তাহাই একটু দেখা যাক। এক দিকে ঘেঁটুর পূজা হইতে থাকে, অন্য দিকে বালকেরা দল বাঁধিয়া বিষম লগুড়হস্তে মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে, যেন তাহাদের মনের ভাব এই যে, কতক্ষণে বিষম লগুড় প্রহারে ঘেঁটুর অস্তিত্ব লোপ করিবে। পূজার বিলম্বও যেন তাহাদের পক্ষে অসহ্য। লগুড়াঘাতে ঘেঁটুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিলেই যেন তাহাদের সকল জ্বালা দূর হয়। কারণ তিনি খোস পাঁচড়ারূপী সেনাগণ পাঠাইয়া তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিয়াছেন। তাহারা ২।৩ মাস বিষম যন্ত্রণায় মরিয়াছে। দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় নাই। তাহাদের স্বভাবসুলভ কোন লক্ষণই দেখাইতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদের বড় কোপ হইবার কথা! এখন তাহারা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে! দেখিতে দেখিতে ঘেঁটুর পূজাও শেষ হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে বিশাল যষ্টির আঘাতে ঘেঁটুর উত্তমরূপ দক্ষিণা সহ বিসর্জ্জন হইল। বিসর্জ্জনান্তে প্রবীণাগণ পুত্র, পৌত্রাদি সহ "ঘেঁটু যায় খোস পলায়" আওড়াইতে আওড়াইতে গৃহে ফিরিয়া যান। সেই দিবস সন্ধ্যার পর দেখা যায় যে, কতকগুলি যুবক ও বালক ঘেঁটুর গীত গাহিয়া বেড়াইয়া থাকে। সে কবিতা যে কিরূপ আনন্দপ্রদ এবং অল্প-বয়স্ক বালক ও অশিক্ষিত কৃষকগণ তদীয় মেধা হইতে যে কি অনুপম দ্রব্য বাহির করিয়াছে, তাহা শুনিলে অতীব প্রীত হইতে হয়। ছন্দপতনাদি তাহাতে বড় একটা দৃষ্ট হয় না। আমরা এই মনোহর গীতশ্রবণান্তে দেখিয়া থাকি যে, তাহারা একটি কাগজের রথ সদৃশ মঞ্চমধ্যে ফুল দিয়া ঘেঁটুকে স্থাপন করিয়া তাঁহার অঙ্গ ভাঁটফুলে সুশোভিত করে ও তন্মধ্যে একটি মিটমিটি আলো জ্বলিতে থাকে। সেই 'তার' তাহারা একটি বাঁকের এক পার্শ্বে স্থাপন করিয়া অপর পার্শে ঘেঁটুর চাউলপূর্ণ 'ঝুলি' রাখিয়া কাঁধে করিয়া একজন দাঁড়াইয়া থাকে, আর তাহার সহচরবৃন্দ 'ঘেঁটু যায় খোস পলায়' ইত্যাদি গীত গাহিয়া গৃহস্থদের মনস্তুষ্টি করিয়া চাল, পয়সা আদায় করিতে থাকে। পর দিবস দেখা যায় যে, তাহারা নিজেই সুন্দর ভাবে একটি পাকশালার ব্যবস্থা করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয় এবং পাকান্তে কত অভাবনীয় আনন্দে আহারে ব্যাপৃত হয়। সে আনন্দ, সে উৎসাহ দেখিলে মনে হয়, হায়! ভারত কি সুখের স্থান ছিল, বঙ্গ কি সুখের আবাস ছিল।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

মারসি মারভিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই কথা বলিয়া মারসী হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিল। লর্ড মারভিল নীরবে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মারসী পুনরায় বলিল "গত রাত্রিতে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে স্বপ্নের কথা আমার মন হইতে কিছুতেই বিদূরিত হইতেছে না। সেই জন্য আপনাকে সে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। শ্বেত তুষারে আবদ্ধ উত্তর মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধীয় সোমট্রার অর্থাৎ সমাধিপ্রান্ত নামক চিত্র কি আপনি লণ্ডনের আর্ট গ্যালারীতে দর্শন করিয়াছেন?" লর্ড মারভিল মারসীর এই কথায় সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিলে মারসী বলিতে লাগিল—"গত রাত্রিতে আমি নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি কোন একটি বৃহৎ সমুদ্রবন্দরে উপস্থিত হইয়াছি। যতদূর দেখিতে পাইলাম দেখিলাম, সেই সুবৃহৎ সুন্দর বন্দর বহু সুবৃহৎ তরণী-সমূহে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম যে, তন্মধ্য হইতে একটি সুসজ্জিত তরণী মহাসমুদ্রে যাত্রা করিবার উদ্দেশে বন্দর পরিত্যাগ করিল। আমার দৃষ্টি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সমুদ্রপ্রস্থানোন্মুখী তরণীখানি অনুসরণ করিতে লাগিল। তৎপরে সহসা এক অকূল মহাসমুদ্র আমার সম্মুখে বিস্তৃত দেখিলাম। সেই সময় সেই অকূল মহাসমুদ্র ঘোর ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরে আমরা দেখিলাম যে, আমার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট তরণী সেই ঝটিকা-গ্রস্ত মহার্ণবে মাস্তুলহীন ভগ্ন অবস্থায় আহত হইতেছে, তথাপি সমুদ্রতলে নিমগ্ন হইতেছে না। এই ভগ্ন তরণীর ন্যায় আমার জীবনতরণী সংসার-সমুদ্রে আহত হইতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি জলমগ্ন হইতেছে না। যদিও আমার জীবন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি এক্ষণে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এক্ষণে সাহসের সহিত জীবনসমুদ্রের ঝটিকার সহিত সংগ্রাম করিতে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসমান দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিবার সম্মানের অধিকারিণী হইয়া এক নিরাপদ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছি। আমার জীবনের অন্ধকারময় সময়ে আপনি আমাকে পথ দেখাইয়া নিরাপদ স্থানে পরিচালিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি।"

লর্ড মারভিল এতক্ষণ নীরবে মারসীর কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি মারসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিস মারভিল, আপনি আমার বন্ধুতা লাভ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হায়, সত্য কি আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না?"

লর্ড মারভিল যেরূপ বেদনা-ক্লিষ্ট স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় যে তাঁহাদের আসন্ন চিরবিদায়-সম্ভাবনায় গভীর কষ্টে বিদীর্ণ হইতেছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তৎপরে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"মিস মারভিল, আপনাকে কত ভাল বাসিয়াছি, তাহা কি আপনি জানেন? আমি যদি বাগ্দান না করিতাম, তাহা হইলে আপনাকে আমার স্ত্রী হইবার জন্য নিশ্চয়ই অনুরোধ করিতাম। আমি আপনাকে দেখিবার পূর্ব্বে সমাজের এক প্রকার আবর্জ্জনার ন্যায় বাস করিতেছিলাম, আপনার সহিত পরিচিত হইয়া আমার মন উন্নত হইয়াছে। আমার বিবাহের কথা যদি বলেন, আপনি অবশ্য অনুভব করিতেছেন যে, এলোইসের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রেমের সঞ্চার হয় নাই। তাহার সহিত আমার বিবাহ একটা আর্থিক চুক্তিমাত্র। তাঁহার কোটি মুদ্রা আমার লর্ড উপাধী বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে। সেই জন্য তাহার সহিত আমার বিবাহের এই চুক্তি হইয়াছে। আমার জমীদারী বন্ধক পড়িয়াছে। আমার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। সেই জন্যই ধনশালিনী এলোইসকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এলোইস সুন্দরী ও মনোমোহিনী, সত্য। আপনার সহিত যত দিন না পরিচিত হইয়াছিলাম, ততদিন এলোইসকে ভাবি-পত্নীরূপে নির্ব্বাচন করিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম। আপনার সহিত পরিচিত হইবার পর প্রকৃত প্রেম কি স্বর্গীয় ও পবিত্রতাময় বস্তু, তাহা আমি বুঝিয়াছি, এবং আপনার প্রতি আমার প্রেম যে কত গভীর তাহা এক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এলোইসকে ভাবি-পত্নীরূপে নির্ব্বাচন করিয়া আমি কিরূপে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে বাগ্দান বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রসঙ্গ এলোইসের নিকট আভাসে উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রথমে সে আমার কথা বুঝিতে পারে নাই বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তৎপরে আমি তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম যে, আমি তাহাকে ভাল বাসি না। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যে ভালবাসা পাইবার অধিকার আছে, আমার নিকট সে সেরূপ ভালবাসা প্রত্যাশা করিতে পারে না। এলোইস আমার এই কথার উদাসীন ভাবে উত্তর করিল যে, সে তাহা জানিয়াছে, ইহাতে তাহার কিছু আইসে যায় না। এক্ষণে আমি স্বহস্তে যে শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা পরিধান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

লর্ড মারভিল এই সমস্ত কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তখন মারসী প্রাণপণে হৃদয় দৃঢ় করিয়া সজোরে উত্তর করিল—

এরূপ যখন ঘটিয়াছে, তখন আপনার তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। আমাদের উভয়ের পক্ষে ইহা অতি কষ্টকর। কিন্তু

আমি জীবনে কখন আপনার উপযুক্তা স্ত্রী হইতে পারিতাম না। অতএব এলোইস যে আপনার স্ত্রী হইতেছেন, ইহা ভালই হইয়াছে।"

লর্ড মারভিল বলিলেন "মিস মারভিল, আপনি অতি কঠোরচিত্তা রমণী, সেই জন্যই এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলিতেছেন। আপনি আমার জন্য একটুমাত্রও দুঃখিত হইতেছেন না।"

মারসী বলিল—

"দুঃখিত হওয়া অতি সামান্য কথা মাত্র। আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমি দুঃখিত হইতে সাহস করিতেছি না ও হৃদয়ে কতদূর শক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাকে চিরবিদায় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছি?" এই কথাগুলি বলিয়া মারসী অন্য গৃহে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে চা প্রস্তুত করিবার সমস্ত সরঞ্জাম আনয়ন করিয়া লর্ড মারভিলের সম্মুখে উপবেশন করিয়া চা প্রস্তুত করিতে করিতে বলিল "আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া চা পান করিতে হইবে, আমি শীঘ্রই চা প্রস্তুত করিতেছি"। লর্ড মারভিল মারসীকে চিন্তিত দর্শন করিতে লাগিলেন। মারসীর সামান্য-পরিচ্ছদ-পরিহিত সুগঠিত ঈষৎ ক্ষীণ দীর্ঘ দেহ, মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের ন্যায় উন্নত গ্রীবাদেশ, ও গভীর ভায়োলেট বর্ণের ঘন-পক্ষ্ম-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়ে সে কেমন সুন্দরী দেখাইতেছিল। তাহার চলা ফেরা কেমন সৌন্দর্য্যময়। লর্ড মারভিল তাহাকে বিমুগ্ধনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সুন্দরী উন্নতহৃদয়া বালিকার প্রতি তাঁহার প্রেম কত গভীর ও কত দৃঢ়, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আরাধ্যা দেবীর আসন্ন বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় তাঁহার চিত্ত এরূপ ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর মারসীর সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। মারসীর প্রদত্ত চা পান করিতে অস্বীকার করিয়া প্রস্থানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—

"আপনি বলিতেছেন যে জীবনে আর আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে না। আপনি কি আর একটি বারও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না?"

মারসী মস্তক আন্দোলন করিয়া অসম্মতি জানাইলে লর্ড মারভিল বলিলেন "তবে এক্ষণে আমি যাই"।

মারসী বলিল—

"হাঁ, আপনি প্রস্থান করুন"।

লর্ড মারভিল বলিলেন "চিরকালের জন্য?"

মারসী বলিল—

"হাঁ, চিরকালের জন্য, কারণ ইহার পর যদি আমরা পরস্পরকে বন্ধুরূপে ভালবাসি, তাহা হইলেও লোকে তাহা দূষণীয় ভাবিয়া নিন্দা করিবে।"

লর্ড মারভিল মারসীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আর তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। সপ্রেমে মারসীর

হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে বিধাতা চিরবিদায়গ্রহণে বিরহক্লিষ্ট মারসী মারভিল ও লর্ড মারভিলের ভাগ্যগগন সহসা এক বিবিধ বর্ণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে উত্তর মেরু প্রদেশে বহু কাল পরে এক অভাবনীয় গ্রীষ্মকালের আবির্ভাবে জমাটবদ্ধ তুষাররাশি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইল। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ইংরাজ নাবিক সার রবার্ট ম্যাকক্লার যে রণতরীর নাবিকপদে বৃত হইয়া বহুসংখ্যক সাহসী অনুচর সমভিব্যাহারে উত্তর মেরু সাগরের পরপারে ভূভাগ আবিষ্কারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই রণতরী শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহাদিগের নেতৃত্বাধীনে এই রণতরী উত্তর মেরু সাগরে গমন করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই হিমসাগরে আবদ্ধ-কালে ইহার বক্ষোপরি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছে সত্য। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তুষারসাগরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও ইহার সাজ সরঞ্জামের এবং ইহার ক্যাবিনের অভ্যন্তরে অবস্থিত দ্রব্য সামগ্রী ও অনুসন্ধানতত্ত্বমূলক এবং অন্যান্য কাগজ পত্র অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বহুকাল পরে মেরু সাগরের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রেরিত এই রণতরীর প্রত্যাবর্ত্তনসংবাদে সমগ্র ইংলণ্ড উৎসুক অন্তঃকরণে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উত্তর-মেরু প্রদেশের না জানি কি রহস্যময় সংবাদ সে বহন করিয়া আনিতেছে!

... ...

লর্ড মারভিল যে দিন মারসী মারভিলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, সেদিন হইতে মারসী নিস্তেজ ও অবসন্ন ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল। সে প্রত্যেক দিন মাদাম লিগের দোকানে গমন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি যথারীতি সম্পাদন করিয়া যাইত। কিন্তু তাহার বিষাদক্লিষ্ট মন সর্ব্বদা লর্ড মারভিলের চিন্তায় রত থাকিত। তিনি বিদায়কালে তাহাকে যে মধুর কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেইগুলি পুনঃ পুনঃ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে লর্ড মারভিলের অদর্শনক্লেশ তাহার অন্তঃকরণকে অধিকতর ব্যথিত করিয়া তুলিত। যতই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই মারসীর মন অত্যন্ত অবসন্ন ও তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার গণ্ডদেশ মধুর রক্তিমবর্ণের পরিবর্ত্তে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু হায়! মারসীর এই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া দেখিবার কেহই ইহলোকে ছিল না। উদ্যানে বসন্ত অবসানে শীর্ণ পুষ্প যখন শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন কাহারও

সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি পতিত হয় কি?

এই সময়ে মারসী প্রত্যেক দিন লর্ড মারভিলের বিবাহসংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেখিবার প্রত্যাশা করিতে লাগিল। কিন্তু কত দিন কত সপ্তাহ অতীত হইয়া যাইল, তথাপি লর্ড মারভিলের বিবাহের কোন সংবাদ প্রকাশিত হইল না। ইহাতে লর্ড মারভিলের কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা করিয়া মারসী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। লর্ড মারভিল অথবা মিস এলোইস, উভয়ের মধ্যে কেহ কি পীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে কি বিবাহের এই বিলম্ব ঘটিয়াছে? এই চিন্তা মারসীর মনে উদিত হইলে মারসী অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যদি লর্ড মারভিল এলোইসের বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার নিকট আগমন করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেন। এইরূপ নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় মারসীর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

পূজা।

তুমি মোর ধ্রুব তারা হৃদয়ের স্বামী।
কি দিয়া পূজিব বল
তোমার পদযুগল।
পূজা-উপচার নাথ! কোথা পাব আমি?
গোটা কত ফুল ফলে
বিল্বদল গঙ্গাজলে
উঠে না যে মন মোর কেন তা না জানি।
মোর শুধু মনঃ বল
মন্ত্র, তন্ত্র, কিছু নয়,
যাগ, ব্রত, উপবাস কিছুই না মানি।
এই শুধু বুঝি বিভু,
আমি দাস, তুমি প্রভু,
তোমারি জগত আর তুমি তার পতি।
তোমারি নির্দেশমতে
যা গো কাজ পাব হাতে,
করিব সাধন তার—তাই তো যুকতি।
তাহাতেই পূজা হবে,
তুমি যাহে তৃপ্ত র'বে,
পূজার মতন পূজা—প্রাণের আহুতি।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

নিবেদন।

হে দেবতা! হে মহান্! ওহে মহেশ্বর,
আমারে নিঃস্পৃহ কর যশ, খ্যাতি, ধনে।
যা কিছু পার্থিব, প্রভু! যা কিছু নশ্বর,
যেন গো সে সব মোর নাহি পড়ে মনে।
পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, বিপদ সম্পদে
অধীর না হই যেন আশা বা নিরাশে,
যেন হে পরম পিতঃ! ওই রাঙ্গা পদে
সকল সময়ে মতি রহে এ মানসে।

অভাব জানায়ে দিও, নিত্য নব কাজ
সাধিতে সামর্থ্য দিও আমি দুরবল।
পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব, ওগো রাজরাজ!
তোমারি করুণা কৃপা আমার সম্বল।
এই নিবেদন দেব! তোমারি চরণে
যেন মরি আমি তব কার্য্য সমাধানে।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।
পাণিহাটী "অক্ষয় কুটীর।"

নূতন সংবাদ।

অধ্যাপক এলেন নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, পৃথিবীর বয়স এখন প্রায় এক শত পঞ্চাশ কোটী বৎসর।

আগামী ৮ই এপ্রেল বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর লর্ড ফারমাইকেল দার্জ্জিলিঙ্গ যাত্রা করিবেন।

এবার ভারত-সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় সমিতির তৃতীয় অধিবেশন তারকেশ্বরে হইবে। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিই এখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়-সমিতির সম্পাদক স্বামী চিদানন্দ, তারকেশ্বর, হুগলি, এই ঠিকানায় লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সে আর লটারি খেলিতে দিবেন না। ফরাসীদের লটারী-সমিতেতে অনেক ভারতবাসীই টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?

দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিশ্রুত দানের প্রথম দেয়—২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় মিঃ আগা খাঁ ও মিঃ হাসান ইমাম মহোদয় প্রত্যেকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-ভাণ্ডারে ৫০০০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

কুচবিহারের নবীন মহারাজা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পীড়িত ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

মহারাজার দান—কাশীম বাজারের দানশীল মহারাজা শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিবিধ সৎকার্য্যে দানের কথা অবশ্যই সকলে অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজা বাহাদুর যখন ক্রেডিট সোসাইটীর কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুরে গমন করেন, তখন শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর প্রসাদ সিং, রামনারায়ণ অগস্তী ও শীতল বাবু তাঁহাকে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে ঘাটালে যে "বিদ্যাসাগর হল" নির্ম্মিত হইতেছে, উহা নির্ম্মাণার্থে এবং বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

মাতার নামে স্থাপিত "ভগবতী ইনিষ্টি-টিউসন্" নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় মহারাজা উক্ত দুই বিষয়েই সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি, মহারাজা বাহাদুর এই দুই কার্য্যে বিশেষরূপে অর্থ সাহায্য করিবেন।

বামারচনা।

তুমি ও আমি।

তুমি সূর্য্যের মত উদয় হইও
আমার চিত্ত-আকাশে,
দূরিত হইবে হৃদয় আঁধার
তোমারি জ্যোতি-পরশে।
তুমি চন্দ্রের মত সুনির্ম্মল হয়ে
ধীর আঁখিতে চাহিও।
তুমি তটিনীর মত চিত্ত সাগরে
কত লহরী তুলিও।
তুমি পবনের মত ধীরে বহে যেও,
আমি সৌরভ হয়ে মিশিব।
তুমি পুষ্পের মত মধু বিতরিও,
আমি ভ্রমর হয়ে লুটিব।
তুমি কোকিলের মত দূর প্রান্তরে
গাহিও মধুর গান,
আমি প্রতিধ্বনি হ'য়ে ছুটিব সেথা
মিশাতে প্রাণের তান।
তুমি বর্ষার মত হৃদয়ে আমার
স্নিগ্ধ প্রবাহ ঢালিও,
আমার প্রাণের ক্লিষ্ট বাসনা
নিমেষের তরে নাশিও।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়,
দ্বারভাঙ্গা।

বিশ্বাস।

প্রভু! তুমি আছ সব ঠাঁই
এ বিশ্বাস যেন না হারাই,
আছ মানবের চারু মুখে,
আছ জলদের কালো বুকে,
আছ নীল নীলিমার কোলে,
প্রভু হে জ্ঞান নয়ন খুলে,
তুমি জাগিও এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম বিলায়ে
দূরিত করিও চিত্ত-আঁধার,
হে পিতঃ! প্রণিপাত,
চরণে তোমার!!

শ্রীপ্রিয়বালা রায়,
দ্বারভাঙ্গা।

শোক-গাথা।

(১)

আঘাতের প্রতিধ্বনি আবার উঠিল,
হিমাদ্রি হইতে সিন্ধু আবার কাঁদিল,
আবার এ পরিবারে
নিদারুণ শোকভারে
মর্ম্মাহত আজ সবে বজ্রাহতপ্রায়!
নর নারী মিলে আজ শোক-গাথা গায়!

(২)

নৃপতি "নৃপেন্দ্র" শোক না তুলিতে হায়!
আবার ঘটিল কি সে সিন্ধুর বেলায়,
নৃপতি "শ্রীরাম" নাই,
হায় কি শুনিতে পাই!
বিধানের পরিবারে পুনঃ বজ্রপাত,
আঘাতের পরে পুনঃ আসিল আঘাত!

(৩)

শিশু সম যাঁর শান্ত সরল প্রকৃতি,
শিশু সম যাঁর চির কোমল মূরতি,
শিশু সম সরলতা,
শিশুর সরল কথা
জীবনে চরিত্রে আর ভাষায় যাঁহার,
হারাইল তাঁরে আজ এই পরিবার!
দুই দিকে দুই জন গিরিশৃঙ্গ মত
বিধানের পরিবারে ছিলেন নিয়ত,
দুই শৃঙ্গ ভেঙ্গে গেল,
আকাশ আঁধার হলো,
বিধাতার বিধি সব কে বুঝিবে হায়!
ডুবিল আশার সূর্য্য ঘোর নিরাশায়!

(৫)

দুইটী ভগিনী আজ দুই দিক হ'তে
দুই জনে এক স্রোতে তাঁহার ইচ্ছাতে
চলেছেন এক পথে
জীবনের এক ব্রতে,
চলেছেন শুধু তাঁর ইচ্ছার পালনে,
এক মন্ত্রে চলেছেন আজি দুই জনে।

(৬)

"সুনীতি", "সুচারু" প্রিয় ভগিনী তোমরা
তোমরা ভক্তের কন্যা ভক্তহস্তে গড়া,
ভক্তের সে উচ্চ আশা
ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা,
ভক্তের শোণিত বয় তোমাদের প্রাণে
ধন্য হও তাঁর কাযে চির আত্মদানে।

শোকসন্তপ্তা ভগিনী
সুমতি,
সুনীতি কলেজ, কুচবিহার।

জাহ্নবীতীর।

এই কি সে নিমতলা জাহ্নবীর তীর?
এইখানে এই ঘাটে—স্মরিতে হৃদয় ফাটে,
হইয়াছে ভস্ম মোর খোকার শরীর!
একি সেই নিমতলা জাহ্নবীর তীর?

নন্দন-সুবাস-ভরা, অমরের চির হরা,
শুকায়েছে এখানে কি সে ফুল রুচির ?
এই কি সে নিমতলা-তীর ?

মেঘে ফেলিয়াছে গ্রাসি এখানে কি তম-নাশি
সুধাভরা দেহখানি সে শিশু শশীর ?
একি সেই চিতাভূমি জাহ্নবীর তীর ?

প্রভাতের ফুল্লাম্বর শূন্য ক'রে, মনোহর,
এখানে কি অস্ত গেছে তরুণ মিহির ?
এই কি সে নিমতলা জাহ্নবীর তীর ?

মধুময় সন্ধ্যাকালে সহসা কি গেছে চ'লে
হেথা হ'তে বসন্তের মলয়সমীর ?
খোকার শয়নস্থান এ কি গঙ্গা-তীর ?

প্রফুল্ল চাঁদনি রাতে থেমেছে কি হেথা হ'তে
মৃদুল মধুর তান নৈশ বাঁশরীর ?
এই কি গো নিমতলা জাহ্নবীর তীর ?

হৃদে ক'রে বজ্রাঘাত খোকা মোর অকস্মাৎ
হেথা কি ডুবেছে গর্ভে কাল-জলধির ?
এই কি গো নিমতলা ভাগীরথীতীর ?

জীবনপ্রভাতে মোর জীবন-স্নেহের ডোর
ছিঁড়েছে কি এইখানে পোষা পাখীটীর ?
এই কি সে নিমতলা জাহ্নবীর তীর ?

অসার আঁধারভরা—হৃদয়ের ধ্রুব তারা
এখানে কি নিভে গেছে এই অভাগীর ?
এই কি সে নিমতলা জাহ্নবীর তীর ?

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী
কাশিমপুর।

ফিরে গাও।

কে তুমি প্রাণের মাঝে
তুলিয়া মধুর তান,
আধ চাপা চাপা সুরে
গাহিতেছ কোন্ গান।
ঝঙ্কারিছে হৃদি-বীণা
সঙ্গীতের তান শুনি,
হরষে উঠিছে নাচি
স্তবধ পরাণখানি।
গাও ভাই! গাও গাও
ছাপায়ে অম্বরতল,
কাঁপায়ে হৃদয়খানি
ঢাল সুধা ঢাল ঢাল!
বাথিত হৃদয়ে মম
আজি এ সঙ্গীততানে
পুরাতন স্মৃতিগুলি
জেগে উঠে সংগোপনে।
গাও ভাই! ফিরে গাও,
ও সুরে ছাপিয়ে ফেল,
খুলে যাক অবরুদ্ধ
হৃদয়ের অরগল।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

সাধ।

গাহিব বিজনে, আপনার মনে,
বিহগের মত
বিভুগুণগান।

সুযশঃ সৌরভে, বিকাব নীরবে,
কুসুমের মত
মোহি জন প্রাণ।

বচনসুধায়, তুষিব সবায়,
নিশাকর মত
দিয়ে স্নিগ্ধ ধারা।

ভুলিয়া আপনা, সাধিব সাধনা,
তটিনীর মত
রয়ে মাতোয়ারা।

সহিব ধরার, যত ব্যথাভার
হিমাদ্রির মত
অবিচলবুকে।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি, দিব দেবে ডালি,
উষাবালা মত
নিতি মনসুখে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 584. April, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮৪ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩১৮। | ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিঃ মণ্টেগু—শুনা যাইতেছে, সহকারী ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে থাকিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপার-সমূহের আলোচনা করিবার জন্য আগামী শীতকালে ভারতবর্ষে আসিবেন। ভারতের শাসনপদ্ধতির প্রতি ভারত-সচিব মহাশয়ের দৃষ্টি পড়াতেই ভারতীয় শাসন-কার্য্যের আলোচনা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। এতকাল পরে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে মনো-যোগী হইতেছেন দেখিয়া আমরা যারপর নাই প্রীত হইলাম।

ভূপালে স্ত্রীশিক্ষা—ভূপালের বেগম সাহেবা ভূপালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন, এ সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে নিজ রাজ্যে একটী উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ছয় লক্ষ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা ভূপালের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে এবং স্বয়ং বেগম সাহেবা নিজ তহবিল হইতে ১০০০০০ টাকা ও বেগম সাহেবার পুত্র-বধূগণ ১৯০০০০ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। সংকল্পিত বিদ্যালয়টী যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে আদর্শ বিদ্যালয়

হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আমরা এই সাধু সংকল্পের সুফল কামনা করি।

বঙ্গীয় শিল্প-বিদ্যালয়—শুনা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার শীঘ্রই শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পিত হইবে। এরূপ হইলে শিল্প-বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের বিশেষ সম্ভাবনা।

ভারতে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা—ভারত গবর্ণমেণ্ট এ দেশে চিনি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত বৎসর মিঃ এ, হোল্‌ম যুক্ত প্রদেশে চিনি উৎপাদনের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজেও একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষিবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ কভেন্টি বঙ্গদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এক রিপোর্ট দিয়াছেন। এ দেশে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়, আশা করা যায় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীর চেষ্টায় এদেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইবে।

মহিলাদিগের উচ্চপদ—ম্যাডাম কুরি বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ফ্রান্সে অধ্যাপকতা কার্য্য করিতেছেন। আমেরিকাতে অনেক মহিলা মান-মন্দিরে কার্য্য করেন। শ্রীমতী এড্‌মি ডণ্ডেন প্যারিসের মান-মন্দিরে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী ক্লেমিংনাম্নী এক স্কট মহিলা আমেরিকার হার্বার্ড কলেজে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সুযোগ্য মহিলাগণকে এইরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

ভারতে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক—অনেকের ধারণা যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সম্প্রতি যে লোকসংখ্যা গণনা হইয়া গিয়াছে, মিঃ গেইট তাহার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নারী অপেক্ষা পুরুষ অনেক অধিক। তিনি নারীর সংখ্যা হ্রাসের দুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম কারণ নারীগণের অল্প বয়সে ও অনুপযুক্ত অবস্থাতে বিবাহ হওয়াতে তাহারা নানা রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং শীঘ্র তাহাদের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় কারণ অবরোধপ্রথা। নারীগণ গৃহে আবদ্ধ থাকাতে প্লেগ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ তাঁহাদিগকে সহজে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়। ইঁদুরে প্লেগ ও মশাতে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে। নারীগণ গৃহে আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ইঁদুর ও মশার অধিক সংস্রবে আসিতে হয়। ইহাতেও অনেক নারীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নারীদিগের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়াতে তাঁহাদিগের সংখ্যারও হ্রাস হইতেছে। নারীদিগকে রক্ষা করিতে হইলে এই সকল বিষয়ের প্রতিকার একান্ত আবশ্যক।

লর্ড কারমাইকেলের অভিনন্দন—ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, বেঙ্গল মসলেম লিগ, ভারত সভা বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোলডার্স এসোসিয়েসন ও ন্যাসনেল চেম্বার অব কমার্সের সদস্যগণ লর্ড কারমাই-কেলকে অভিনন্দন প্রদান করিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্ট প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল অভিনন্দনপত্রসমূহের উত্তরে কয়েকটী চিরস্মরণীয় ও চিরপালনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ভারত সভা জনসাধারণের ও গবর্মেণ্টের একত্র হইয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমিও গবর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের একত্র কার্য্য করার আবশ্যকতা স্বীকার করি। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যদি কোন সভা থাকে, তাহা এই ভারত সভা। ভারত সভা যখনই মনে করিবেন আমার যাহা করা উচিত, আমি তাহা করিতেছি না, আশা করি, সভা তখনই তাহা আমাকে জানাইবেন।"

লর্ড কারমাইকেল মস্‌লেমলিগের অভি-নন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন "আমি বিশেষ কোন ধর্ম্মাবলম্বী বা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য আসি নাই। আমি যথাসাধ্য সর্ব্ব শ্রেণীর উপকার করিতে আসিয়াছি"। তিনি আরও বলিয়াছেন "জনসাধারণের সদিচ্ছা গবর্ণ-মেণ্টের সহায়তা করিলে গবর্ণমেণ্ট যেমন দৃঢ় হয়, অন্য কিছুতেই তেমন হয় না। গবর্ণমেণ্ট যখন জনসাধারণের ইচ্ছা বুঝিতে পারেন এবং তাহা যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, আমি বিশ্বাস করি, জনসাধারণ তখন যেমন সন্তুষ্ট হয় এবং তাহাদিগের কার্য্য প্রসারিত করিতে সমর্থ হয় অন্য কখনও তেমন হয় না"। তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিবার জন্য ভারত সভাকে অনুরোধ করিয়া লর্ড কার্মাইকেল যে কথা বলিয়াছেন, আর কোন্ গবর্ণর এরূপ বলিয়াছেন কি না, মনে হয় না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, লর্ড কারমাইকেল তাঁহার অভিলষিত পথ অনুসরণ করিয়া জয়যুক্ত হউন।

দান—কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত কানাই-লাল সেন নামক জনৈক মধ্য শ্রেণীর গৃহস্থ ব্যক্তি জনহিতকর নানা কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি যে সকল কল্যাণকর কার্য্যের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

আতুরাশ্রম ২৫৲, হিন্দু অনাথ আশ্রম ২৫৲, মুসলমান অনাথ আশ্রম ২৫৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ২৫৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড (নববিধান সমাজ) ৫০৲, বিপন্ন ব্রাহ্ম পরিবার ফণ্ড (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ) ৫০৲, অন্ধ বিদ্যালয় ২৫৲, মূকবধির বিদ্যালয় ২৫৲, লিটিল সিষ্টার্স অব দি পুয়োর ২৫৲, নৈশ শিল্প বিদ্যালয় ৫০৲, রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় (নববিধান সমাজ) ৫০৲, ঐ (সাধারণ সমাজ) ৫০৲, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারি-টেবল সোসাইটি ৫০৲, রামকৃষ্ণ দাতব্য ভাণ্ডার ৫০৲, মহিলা শিল্পাশ্রম ৫০৲,

কোন নিপীড়িত জাতির সাহায্যার্থ (কোন বিশেষ হিন্দু সভায়) ৫০৲, নিপীড়িত জাতির সাহায্যার্থ (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ) ৫০৲, দুইজন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যার্থ ১১০৲, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি ১০০৲, শিল্প বিজ্ঞান সমিতি ১০০৲, সাধারণ দুর্ভিক্ষ তহবিল (নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ৫০৲, ঐ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ৫০৲), সঞ্জীবনী পত্রিকার হস্তে ১০০৲, কোন স্থানের জল কষ্ট নিবারণার্থ কূপ খনন জন্য ২৫৲, সিটি কলেজের জন্য ১০০৲, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন (নববিধান সমাজের বালিকাবিদ্যালয়) ৫০৲, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ৫০৲, বিপন্ন স্ত্রীলোকগণের সাহায্যার্থ (সঞ্জীবনী সম্পাদকের হস্তে) ১০০৲, দেবালয় (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত) ৫০৲, সাধনাশ্রম (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ) ৫০৲, সুবর্ণবণিক দাতব্য সভা ১০০৲, একজন বিপন্ন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ১১৫৲, তত্ত্ব বিদ্যাসভা (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ) ৫০৲, ৪ জন হিন্দু বিধবার সাহায্যার্থ ১৭২৷৷০, আত্মীয় প্রতিবেশী ও বন্ধুগণের সাহায্যার্থ ১১৪৩৲, প্রতিবাসী ডোম জাতির শিক্ষার্থ ৫০৲, ব্রাহ্ম বোর্ডিং ও ডে স্কুল ১০০৲, জনৈক ঋণপীড়িত ব্যক্তির বাসবাটী রক্ষার্থ ৮০৲, খিদিরপুর পঞ্চানন আশ্রম ৫৲, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ১০০০৲, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার বিভাগ (ট্রষ্টফণ্ড) ১০০০৲। এরূপ দান অতিশয় প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

শোচনীয় মৃত্যু—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি ডাক্তার প্রবেশরঞ্জন রায় কালীঘাট অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষক ছিলেন। চূড়ামণি যোগের সময় তিনি প্লেগ সংক্রামিত বস্তিসমূহ পরিষ্কার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় প্লেগের বিষ তাঁহার দেহে প্রবেশ করে। ২১শে চৈত্র বুধবার বিষের কার্য্য প্রকাশ পায় এবং ২৫শে রবিবার তিনি অকালে প্রিয়তমা পত্নীকে, প্রাণের শিশুসন্তানদিগকে ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ এই শোকার্ত্তদিগের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারপর পুরাতন কাপড় বা চাদরে জামা সেলাই করিয়া হাত বশ হইলে নূতন বস্ত্রে জামাদি সেলাই কাজ স্বচ্ছন্দে লওয়া যাইতে পারে। জামা সেলাই শিখিতে হইলে একটা পুরাণ জাম লইয়া উহা ভাগে ভাগে কাটিয়া ও খুলিয়া

কোথায় কিরূপ জোড়, কোথায় কিরূপ সেলাই আছে, ইত্যাদি মনোযোগ দিয়া দেখিয়া উহাকে আবার ঠিক পূর্ব্বের মত করিয়া জোড় দিবার প্রয়াস পাও। ঐ পুরাণ জামাটী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আবার যদি উহাকে ঠিক জোড়া দিতে পার, তাহা হইলে নূতন জামা সেলাই তোমার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু পুরাণটী ঠিক করিয়া জোড় দিতে অক্ষম হইলে, যতক্ষণ না উহার সকল ভাগ ও সেলাই উত্তমরূপে মনে বসিবে, ততক্ষণ নূতন জামাতে হাত দিও না। তিন চারি দিন ঐরূপে অভ্যাস করিলেই জামা সেলাই শিখিতে পারিবে। আর, জামা ফ্রকাদি সেলাই করিতে পারগ হইবার আগে বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি সাদাসিদে কাজে হাত প্রস্তুত করা ভাল।

সেলাইয়ের কাজ ছাড়া ঘুন্‌সি ভাঙ্গা, ফুলের মালা গাঁথা, তুলা বাছা, শনের দড়ি পাকান প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট কাজ গরীব স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসিয়া করিতে পারে। বোধ হয়, ওসব কাজের কথা শুনিয়া পাঠিকারা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে, এ সংসারে সৎকাজ আপাততঃ যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, মানুষকে উহা কখন নীচ করিতে পারে না। বরং মানুষই নিজের কু-অভ্যাস বশতঃ সচরাচর অনেক কাজকে হীন করিয়া তুলে। নিঃসহায় অবস্থায় পরের গলগ্রহ হওয়া বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের পরিবর্ত্তে যেরূপে হউক নির্দ্দোষ কাজের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন শতগুণে শ্রেয়ঃ। অনেকে প্রয়োজন বশতঃ জীবিকা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য না হইলেও কখন কখন কিছু কিছু অর্থলাভে অনিচ্ছুক নহেন। তাঁহাদেরও বাল্যকাল হইতে কোন না কোন কাজে উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইলে অবসর-মতে মাসে দুই একটাকা উপার্জ্জন হইতে পারে। উহাতে তাঁহাদের সংসারের স্বচ্ছলতা বই অপকার হইবে না। পশমের কাজেও পয়সা করা যাইতে পারে। ভাল করিয়া জুতা, মোজা, গলাবন্দ, জামা প্রভৃতি বুনিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিলে ভদ্র মহিলারা সহজেই উহা কিনিতে অভিলাষী হন। পশমের ফুল, পাখা, ছবি প্রভৃতি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিলে ধনী পরিবারে উহারও ক্রেতার অভাব হইবে না।

অবশ্য বিক্রয়ের জন্য যে কাজ করিবে তাহা যতদূর সূক্ষ্ম, পরিপাটী ও সুরুচি-সঙ্গত করিতে পার, ততই অধিক লাভের সম্ভাবনা। ছোট বড় সব কাজ সাধ্যমত যত্ন ও মনোযোগপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলে আমাদের এ বিস্তৃত দেশে কোন নারীরই জীবিকার অভাব থাকিবে না।

হাত কিম্বা মন দিয়া যেরূপে যেমন
কাজ বিনা হেথা কেহ পারে না জীবিতে,
অন্ন বস্ত্র চাও—খাট উহার কারণ,
নতুবা মরিতে হবে অনাহারে, শীতে।
অথবা হইবে তুমি অপরের দাস,
গঞ্জনায় তাড়নায় মরিবে কত কাল,
ডুবিবে দাসত্ব জলে আনন্দের আশ,

জীবনে জগত হবে যাতনার শাল।
কুসংস্কার বৃথা লজ্জা ত্যজ এই বেলা,
এস সবে উৎসাহেতে করমের ক্ষেতে।
যে কাজে নিযুক্ত হও, করোনাকো হেলা,
উহাই স্বর্গের সিঁড়ি সংসারের পথে।

নারী জাতি কর্ত্তব্য বা প্রয়োজনের নিমিত্ত কিরূপে কি কাজ করিতে পারে, তাহা আমি সাধ্যমত দেখাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন আশা করি, পাঠিকাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ কোন না কোন কাজ করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইবেন। আমি যতই দেখিতেছি ও নিজে যতই খাটিতেছি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, সৎকার্য্য সাধনের ন্যায় পীড়া, যন্ত্রণা ও শোক, দুঃখের মহৌষধ মানবজীবনে আর কিছুই নাই। যাঁহারা নিজের উপযুক্ত সর্ব্ব প্রকার নিয়োগ নির্ব্বাচনে অপারগ, বা জগতের কোন কাজের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তাঁহারাই এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী ও হতভাগ্য। সেই জন্য যে সকল নারী এ পর্য্যন্ত আলস্যে কাল কাটাইয়াছেন, তাঁহারা যদি এখনও কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কাজে নিযুক্ত হন ও উহা যথাসাধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে এখন হইতে তাঁহাদের সকল শারীরিক পীড়া, কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণা, আন্তরিক জড়তা ও হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি অল্প কালের মধ্যে তিরোহিত হইবে। তাঁহাদের শরীর সবল ও মন প্রফুল্ল হইবে এবং হৃদয় শান্ত ভাব ধারণ করিবে। সংসার তাঁহাদের নিকট সুখের আধার ও জীবন আনন্দের আকর হইয়া উঠিবে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে স্বদেশীয় মাতা, ভগ্নী ও কন্যাদের মধ্যে যদি একজনেরও মনে আলস্যে ঘৃণা ও কর্ম্মে আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে আমার লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কেন ও আলসা বৃথা—কেন সদা ছাড় শ্বাস?
সুদূরে অস্পষ্ট যাহা তার তরে কেন আশ?
চারি দিকে যত দৃশ্য আহা কেমন শোভন,
গাহে সবে অবিরল বিভুপ্রেমেতে মগন।
একবার মন দিয়ে শুন ও মধুর ভাষা
পলাবে তোমার যত প্রাণের দুর্ভর আশা।
ফুল, পাখী, কীট সবে নিজ কাজ সাধিতেছে,
তোমাকে ও তব কাজে বার বার ডাকিতেছে।
বুঝ উহাদের কথা, কর কাজ উহাদের সনে,
আপনি আনন্দ উৎস ঝরিবে তোমার প্রাণে।
দেখিবে সকল কাজে অটল শান্তির বাস—
প্রকৃত জীবন ওই—ওর কভু নাহি নাশ।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস।

মহীধর।

দাঁড়া'য়ে ভূধর হ'য়ে মহারাজ
পাষাণের সিংহাসনে।
বন উপবন, পুষ্পে সুশোভন
কিবা দৃশ্য এই স্থানে॥

(২)

ভ্রমর সকল গুন্ গুন্ রবে
মঙ্গল গীত গাইছে।
জানায় এ জনে কাকলীর ছলে
উদয় রবি হইছে॥

(৩)

শিখর তাহায় ভূষারমণ্ডিত
শোভেঃঅতীব সুন্দর।
বিশাল গহ্বর তমোময় সদা
তাহে বসতি জন্তুর॥

(৪)

বনস্থ সদাই করিছে বিরাজ
গিরিরাজের আজ্ঞায়।
ভ্রমরের তানে বিহগের রবে
যেন গিরি গীত গায়॥

(৫)

স্থানেঃস্থানে তথা ধাতুর বসতি,
শোভা পায় গিরি অঙ্গ।
জন্তুগণ সদা করে নানা রব
গিরিশিরে হয় রঙ্গ॥

(৬)

ঝরণার জলে তাপস সকল
স্নানে অতি কুতূহলী।
হংস কারণ্ডব সারস সারসী।
সুখে করে জলে কেলি॥

(৭)

কলাপ প্রসারি নাচে শিখিগণ,
শোভে বিচিত্র চন্দ্রক।
কাননমাঝেতে প্রমত্ত বারণ
দেখায় মত্ততাধিক॥

(৮)

নির্ঝরের বারি বহে অনুক্ষণ।
সুখে পিয়ে জীবগণ।
কদম্ব মালতী আর কুন্দকুল
বৃন্তচ্যুত অগণন॥

(৯)

পন্নগ সকল গহ্বরে লুকায়ে
করে কত আলাপন।
শ্বেতোত্তরী সম শৃঙ্গে ছিন্ন অভ্র
লভে শ্রান্তি অনুক্ষণ॥

(১০)

বিটপপ্রসূনে আর লতাজালে
কিবা সজ্জিত ভূধর।
উদ্ভিদ্ সকল ছায়াদানে তার
হরে তাপ আতপের॥

(১১)

দেব রবি শশী করে উভয়ের
কিবা দৃশ্য দৃষ্ট শৈলে।
প্রকৃতির বাড়ী আছে যে তথায়
হেরিলে মুগ্ধ সকলে॥

(১২)

বিটপীর তলে সিদ্ধগণ বসি
সদা করে বেদধ্বনি।
পুণ্যস্থান গিরি মনোরম অতি
সুপবিত্র বটে ইনি॥

শ্রীনলিনীকান্ত দেব।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিনের আনন্দের মধ্যেও নীরজা আর তেমন মিশিতে পারিল না। তাহার সাধের পিয়োনো, কত সুন্দর সুন্দর উপহার, পিতার স্নেহাশীষ, মাতার চুম্বন, অভ্যাগতদের মঙ্গল কামনা কিছুতেই ক্ষুদ্র একটু কাল মেঘ নীরজার বুক হইতে সরিল না। আলোকপূর্ণ গৃহে, বহু প্রশংসমান চক্ষুর মধ্যে বসিয়া পিয়োনো বাজাইতে বাজাইতে তাহার ক্ষুদ্র শুভ্র অঙ্গুলীগুলি শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তবুও প্রাণপণ যত্নে নীরজা আপনাকে ঠিক রাখিতেছিল। অভ্যাগত-দিগের নিকটে পিয়োনো বাজাইয়া প্রশংসা লইয়াও নীরজার প্রাণে তেমন উৎসাহ হইল না। উৎসবশেষে যখন মাতা আসিয়া শয্যায় শুইলেন, তখন দেখিলেন তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। গিরি-বালা কন্যাকে নিকটে টানিয়া লইয়া হাত সরাইয়া দেখিলেন তাহার নেত্রে অশ্রু-বিন্দু। মাতা বলিলেন "কেন মা"? কন্যা তাঁহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিল "কি জানি মা, আমার মনটা কেন এত কাঁদছে"।

মাতা নীরজার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "ও কিছু নয়, শোন্ একটা গল্প বলি"।

নীরজা বলিল "তবে আমার ছোট বেলাকার গল্প বল"।

"ছোট বেলাকার আবার গল্প কিরে?"

"আমি কার সঙ্গে খেলতুম্? কার সঙ্গে গল্প করতুম্ এই সব"।

মাতা বুঝিলেন। বলিলেন "কার সঙ্গে আবার, যেমন ছোট ছেলেরা খেলে, তোমার দাদার সঙ্গে, আর সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলতে"।

নীরজা একটী ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার তো সে সব মনে হচ্ছে না, কেবল একটী লোককেই মনে পড়ছে"।

গিরিবালা বলিলেন "ও তোমার ভ্রম, তিনি রাত দিন বাড়ীর মধ্যে থাকতেন কিনা, তাই তাঁকে মনে পড়ছে"। নীরজা একটু থামিয়া ভাবিয়া বলিল "হবে"।

আবার একটু ভাবিয়া বলিল "মা আমার যেন একটু কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়, একদিন আমাদের বাড়ীতে খুব বাজনা বেজেছিল, খুব ঘটা হয়েছিল না?"

মা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বলিলেন "কই না, কবে?" "কোনও দিন খুব ঘটা, কি বাজনা, কি আলো হয় নিত মা?"

"না, তুই স্বপ্ন দেখ্ছিস্ নাকি।"

ক্ষুদ্র একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল "আমার হয়ত ও সব ভ্রম, কিন্তু যেন ঠিক মনে হয়।"

সে রাত্রে দুজনেই ঘুমাইল না। মাতা

ঘুমাইল না, অতীতের কত দুঃখের দিন তাহার মনে পড়িতেছিল। নীরজা ঘুমাইল না, এ সব ভ্রম কেন তাহার প্রাণের মধ্যে হইল, ভাবিয়া।

আবার যেমন দিন যায় তেমনি যাইতে লাগিল। নীরজা এ সব কথা ভুলিয়া গেল, সে আবার নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইতে লাগিল। সে আবার পিতার সহিত বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইত, পড়িত, হাসিত, পিয়ানো বাজাইত। সে-দিনকার সে কালো মেঘটুকু প্রবল বসন্তের বায়ুবেগে উড়িয়া গেল, কিন্তু বিমলা বাবু বা গিরিবালা সে কথা ভুলিলেন না। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে নূতন করিয়া নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল যেন তাঁহারা নীরজাকে তাহার বালবৈধব্যের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে না দেন। তাঁহার মনে এই ভয় ছিল যে, প্রথম জীবনে তাঁহার পিতার শিক্ষার ফলে ও তাঁহার সহবাসে নীরজার মনে হয়ত এত শিক্ষা সত্ত্বেও একটু কুসংস্কারের কণা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সমস্ত আশা ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

নীরজা পূর্ব্ববৎ স্কুলে যায় এবং আসিবার সময় গাড়ী থামাইয়া তাহার স্নেহপাত্রী-গুলির সহিত কথা কয়। পার্শ্বস্থ বাটীর দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রত্যহ একজন তাহার গতিবিধি, কথা বার্ত্তা, অযাচিত দান লক্ষ্য করে, তাহা সে এত দিন জানিত না। এক দিন কোন ভিখারীর হস্তে মুদ্রা দিয়া কেহ দেখিতে পাইল কি না ভাবিয়া চকিতনেত্রে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে নীরজা গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইল সম্মুখের দ্বিতল প্রাসাদের রেলিংএ হাত রাখিয়া কে একজন তাহাকে দেখিতেছে। নীরজার বড় ভয় হইল, পাছে সেই ব্যক্তি তাহার পিতা মাতাকে বলিয়া দেয়। সেই দিন হইতে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ দেখিত যে, সেই লোকটি সেই-খানে যেন তাহার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নীরজার বড় ভয় হইল, সে অন্য পথ দিয়া যাইতে লাগিল, এবং ভিখারীদিগকে বলিয়া দিল "তোমা-দিগের যে দিন অভাব হবে, সে দিন ও-ধারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া থেকো"।

সে অন্য একটা নূতন ভিখারিণী দেখিতে পাইল। সে একটি ক্ষুদ্র পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া নীরজার আজ একটু অধিক কষ্ট হইল। নীরজা গাড়ীর একটু দূরে ফুটপাথের কাছে দাঁড়াইয়া সেই বালিকাকে বলিল "আজ তুমি এই সিকিটা নেও, কাল এই-খানে দাঁড়িয়ে থেকো, তোমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমি তোমার জন্য একখানি কাপড় আনিব।" সহসা কয়েকটা কণ্ঠের এককালীন চীৎকার ও ঘোটকের পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক তেজস্বী ক্ষিপ্ত ঘোটক তাহার অতি নিকটস্থ হইয়াছে। সভয়ে বালিকা চীৎকার করিয়া প্রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা হইল,

পলাইবে, কিম্বা কি করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারি দিক হইতে সকলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। কোচম্যান, সহিস ছুটিয়া আসিল। নীরজা দেখিল সম্মুখে ক্ষিপ্ত অশ্ব তাহার উপরে চাপিবার জন্য সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্ব হইতে নীরজা একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। কি হইল সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিল তাহাকে ঘেরিয়া বহুলোক কলরব করিতেছে, সম্মুখে কোচম্যান, সহিস মুখে চক্ষুতে জল দিতেছে। নীরজাকে চাহিতে দেখিয়া তাহারা সকলে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিল "হুঁস হুয়া, আউর ডর নেহি হায়"। নীরজা বিস্মিত হইয়া বলিল "রামদীন, কি হইয়াছে?"

রামদীন্—"দেখো তো, তুম্ এয়সা করনে হো? বড়া লোককা লেড়্কী, সড়ক মে বগীসে উতারকে বেত্তা ভিখ্ মাংতা উন্‌কো সাথ বাত পছাতা। চলো, আজ হাম বাবু কো বোলেঙ্গে।" পশ্চাত হইতে কে কোচম্যান্‌কে বলিল "থাম্ আগে সুস্থ হতে দে"। নীরজা ফিরিয়া দেখিল একজন অপরিচিত লোক, সে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। নীরজা চাহিয়া চাহিয়া চিনিল, যে ব্যক্তি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিত, এ সেই ব্যক্তি। লজ্জায় নীরজার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, মাটীতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তি হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল "কোচম্যান গাড়ী কাছে আন"। কোচম্যান সাহেব বড়ই চটিয়াছেন, একি বিড়ম্বনা, এখনই তাহার সাধের চাকরীটী ও সেই সঙ্গে মস্তকটী যাইতে বসিয়াছিল। উকিল বাবু সহজ লোক নন। তাই নিজের মনে গজ গজ করিতে করিতে সে ব্রুহাম নিকটে আনিয়া বলিল "চলো দিদিমণি! হাম্ আজ বাবুকো বোলেঙ্গে।" সেই অপরিচিত ব্যক্তি মৃদু হাসিয়া নীরজাকে বলিল "অমন করিয়া রাস্তায় না দাঁড়াইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইও, কোনো বিপদ হ'বে না"।

নীরজা লজ্জায় মস্তক নত করিল।

"কোথাও লেগেছে কি?"

নীরজা মৃদু স্বরে বলিল "আজ্ঞা না"।

"আর একটু হ'লেই সর্ব্বনাশ হত, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি ঠিক সময়ে তোমাকে টেনে নিতে পেরেছিলাম, আর এক সেকেণ্ড দেরি হ'লে সমস্ত বৃথা হ'ত।"

নীরজা কোনও উত্তর করিল না। একজন তাহার প্রাণরক্ষা করিল, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, এ কথাও তাহার মনে পড়িল না। তাহার পর যখন নীরজার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া অপরিচিত যুবক বলিল "তবে এখন আমি যাই"। কোচম্যান সপ্তম স্বরে বলিল "নেহি বাবু, আপ হামারা সাথ্‌মে চলিয়ে, নেহি তো উকিল বাবুকো হামরা বাত্‌মে বিশ্বাস নেহি হোগা, উন্‌কা

লেড্‌কী সড়কমে উতারকে ভিখ্‌ দেগা, হামারা ইস্‌মে কসুর কা?" যুবক মৃদু হাসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল "তোমার ভয় নাই, তোমার কসুর দূরের কথা, উকিল বাবু তোমাকে বখ্‌শিস দিবেন, আমার যাইবার আবশ্যক নাই।"

লোকটি নীরজার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?" মৃদুকণ্ঠে নীরজা বলিল "নীরজা।" কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া নিজের মনে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীরজার মিনতিপূর্ণ অনুরোধ না রাখিয়া কোচম্যান সাহেব তাহার প্রভুর নিকটে সমস্ত নিবেদন করিল এবং বিধিমতে প্রমাণ করিল যে, তাহার ইহাতে কোন প্রকার দোষ ছিল না, অপরিচিত যুবাটী বিশেষ জানেন এবং বখ্‌শিসের কথাটাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না। প্রভু যখন সমস্ত শুনিয়া অপরিচিত যুবকের সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন মাত্র করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন, তখন তাহার আপ্‌শোষের সীমা রহিল না। সেই অপরিচিত যুবকের মানবচরিত্রানভিজ্ঞ বুদ্ধিকে গালি দিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইল।

নীরজা ভয়ে এক কক্ষের কোণে লুকাইয়া বসিয়াছিল। পরে পিতার পুনঃ পুনঃ আহ্বান যখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সে কম্পিতদেহে ধীরে ধীরে পিতার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বিমলাচরণ তাহার মাথায় হস্ত রাখিয়া বলিলেন "কোথাও লাগেনি তো নিরো?" নীরজা মাথা নাড়িল। কিয়ৎক্ষন পরে পিতা বলিলেন "গাড়ী থেকে না নেবে এইবার থেকে ভিক্ষা দিও"। নীরজা লজ্জায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। এই পিতার কাছে সে এত দিন এ কথা লুকাইয়াছিল। তিনি কন্যার ভাবটা বুঝিতে পারিলেন এবং দ্বিগুণ স্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন "তুমি যাতে সুখী হবে তাতে কি আমি রাগ করব? তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি সর্ব্বদা কত সহ্য করে আসছি আর ক'রব, তা যখন বড় হ'লে বুদ্ধি হবে তখন বুঝতে পারবে। আমার বা তোমার মার কাছে কি কিছু লুকাতে আছে?" নীরজা নিরুত্তর রহিল।

তাহার পর বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে লোকটি কে?" নীরজা মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি তো চিনি না"। বিমলাবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন "আর কোনো দিন যদি তাঁহাকে দেখতে পাও তাহা হইলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলো। তিনি আজ যা করেছেন তার জন্য আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না।" নীরজা মস্তক নাড়িয়া জানাইল "তাহাকে দেখিতে পাইলে বল্‌ব"।

নীরজার মাতা এই সকল শুনিয়া কোচম্যানকে বারণ করিয়া দিল, কদাচ সে যেন আর নীরজার কথা শুনিয়া সে গলি দিয়া গাড়ি না লইয়া আসে এবং পথে গাড়ি না থামায়। কোচম্যান তাহার পর

তাহাই করিত। কাজেই নীরজার পিতার আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল না। সময়ে সময়ে তাহার মনে হইত, 'বাবা যা বলে দিলেন তা তো বলা হ'ল না।' ক্রমে ক্রমে বালিকা এসব ঘটনা প্রায় ভুলিয়া গেল।

পূজার অবকাশে বিমলাচরণ বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। গিরিবালা পুত্রকন্যা লইয়া প্রতিবার স্বামীর সঙ্গে যান, এবার গেলেন না। কারণ সুরেন্দ্র এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া সে গেল না, কাজেই মাতাও গেলেন না, নীরজারও যাওয়া হইল না।

একদিন গিরিবালা বলিলেন "সুরেন, নিরো, চল্ আমরা আজ ষ্টার থিয়েটরে 'নল দময়ন্তী' দেখ্‌তে যাই, উনি থাক্‌লে তো থিয়েটরে যেতে দিতেন না। সেই যা প্রথম প্রথম এসে দেখেছি, কতদিন থিয়েটর দেখিনি"। পিতার বারণ সত্ত্বেও সুরেন্দ্র থিয়েটরের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। পিতাত এখানে নাই, যদিও জানিতে পারেন, তাহা হইলে মাতার স্কন্ধে দোষ পড়িবে। সুরেন্দ্র মহোল্লাসে বলিল "চল, কিন্তু ষ্টারে নয়, মিনার্ভায় চল, সেখানে আজ 'রোমিও জুলিয়েট্ হবে"। মাতা বলিলেন "ও ছাই ইংরাজী আমি ভাল বুঝতে পারিনে, ষ্টারেই চল্"। সুরেন্দ্র তাহাতে বিরক্তির সহিত বলিল "নল দময়ন্তীর আর কি দেখবে? ও রাবিস্ প্লে, নিরো, ইংরিজি প্লে তোর ভাল লাগেনা?" নীরজা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল "নলদময়ন্তীই তো বেশ"।

মাতা ও ভগ্নীর মত দেখিয়া অনিচ্ছার সহিত সুরেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইল।

ষ্টারে মহাসমারোহে 'নলদময়ন্তী' র প্লে হইতেছিল। চারি দিকে উজ্জ্বল আলোকে, অগণ্য উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দে, সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে, মর্ত্তে সুরসভা বসিয়াছিল। গিরিবালা স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থানে গিয়া বসিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনও পুরুষের সাক্ষাতে বাহির হইতে চাহিতেন না, স্বামীর ভয়ে অগত্যা বাহির হইতেন, কিন্তু 'বাধ বাধ' ভাব এখনও যায় নাই। মাতাকে উপরে যাইতে দেখিয়া মহা বিরক্তির সহিত সুরেন্দ্র কেবল নীরজাকে লইয়া দ্বিতলস্থ ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়া বসিল।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম নীরজার বেশ লাগিল। কত নৃত্য, কত গান ও ভাবময় লীলা, দেখিতে বেশ লাগিল। তার পর যখন সে নলের দময়ন্তীর এক গৈরিক বস্ত্র পরিধান বেশ দেখিল, তখন তাহার বড় দুঃখ হইল। নলের দময়ন্তী-ত্যাগ দেখিয়া নীরজা শিহরিয়া উঠিল। তারপর দময়ন্তীর উন্মাদিনী বেশ দর্শনে ও আকুল বিলাপ শ্রবণে নীরজা মস্তক নত করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্র তাহাকে বলিল "তোমার এতেই এত কান্না! কেবল কতকগুলি 'হা স্বামী', 'জো স্বামী', এ আবার প্লে"।

কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা নীরজার হাত ধরিয়া অতি মধুর স্বরে কে বলিল "নীরজা, কাঁদছ কেন?" নীরজা চমকিত হইয়া

মুখ তুলিয়া দেখিল তাহার প্রাণরক্ষক, সেই যুবক। নীরজার পার্শ্বের আসন খালি ছিল, যুবক তাহাতেই বসিয়া বলিল "কাঁদ্‌ছ কেন? প্লে দেখ"? নীরজা নীরবে ঘাড় নাড়িল। যুবক একবার রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া বলিল "বড় সুন্দর, বড় দুঃখের, সত্যই কান্না আসে"। যুবক নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

নীরজা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" যুবক তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল "সবে এই আস্‌ছি, রাস্তায় একটা বাধা পড়ায় আস্‌তে এত দেরি হ'ল।" নীরজা বলিল" সবটা তো দেখ্‌তে পেলেন না"। "তবুও এলাম, এ অভিনয়টা দেখ্‌তে আমি এতই ভালবাসি। আর একটা কথা"—যুবক আবার মৃদু হাসিল। নীরজা চাহিয়া রহিল। "আর একটা কথা তোমার সঙ্গে দেখা হইল, না এলে তো দেখা হ'ত না।" নীরজা লজ্জায় লোহিতবর্ণ মুখখানি নত করিল।

"তোমার সঙ্গে আর কে এসেছেন?"

"দাদা আর মা"

"তোমার বাবা আসেন নি?"

"না, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন"।

সহসা নীরজার একটা কথা স্মরণ হইল। ত্রস্তভাবে সে বলিল "বাবা আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন"। যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন"?

যে দিন আপনি আমাকে বাঁচান, সেই দিন বাবা বলেছিলেন "সেই লোকটীকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে বলো, তিনি আমার যে উপকার করেছেন, আমি তার কি করে শোধ দিব, ভেবে পাচ্ছি না।" যুবক এবার একটু বেশী হাসিয়া ফেলিল। আদর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "সেই জন্যে? তা তোমার বাবা এলে তুমি তাঁকে বলো যে,তিনি যদি উপকারের কথা বিস্মৃত হ'ন, তবেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।"

"তা নইলে দেখা করবেন না?"

যুবক আবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল "ক'রব, তিনি আগে আসুন। তোমার বাবার নাম কি?" "শ্রীবিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।"

তাহার পর যুবক একে একে তাহারা কটি ভাই, কটি বোন, ভাইয়ের নাম কি, সে কি পড়ে, কোন্ স্কুলে, কোন্ ক্লাসে, তাহার কত বয়স, তাহার দাদা কি পড়ে, সমস্ত জিজ্ঞাসা করিল। শেষে হাসিয়া বলিল "সে দিন গাড়ীতে উঠে, আমাকে দেখে, সে গলি দিয়ে আর যেতে না, না?" নীরজা লজ্জিত হইল। যুবক তাহার চাহনিটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। নীরজা উত্তর দিতে পারিল না।

"সেই জন্যে? না?"

"হ্যাঁ, আপনাকে দেখে ভয় হয়েছিল, পাছে আপনি আমাদের বাড়ীতে বলে দেন।"

যুবক হাসিয়া উঠিল, বলিল "আমি বল্‌তে যাব কেন? আর তুমি কি কিছু অন্যায় কাজ কর্‌ছিলে?" তারপর অভিনয় শেষ হইল। জলস্রোতের ন্যায়

দর্শকগণ ঠেলাঠেলি করিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্র উঠিল, অপরিচিত যুবকও পশ্চাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যপথে নীরজা ফিরিয়া বলিল "বাবা এলে নিশ্চয় যাবেন তো?"

"নিশ্চয়।"

"তিনি কবে আস্‌বেন কি করে জান্‌বেন?"

যুবক হাসি হাসি মুখে বলিল "তা এক রকম করে জান্‌ব।"

"আপনি আমাদের বাড়ী চিনেন?"

"চিনি"।

মাতা ও ভ্রাতার সহিত শকটে উঠিয়া নীরজা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, কিন্তু আর যুবককে দেখিতে পাইল না। তখন ভাল করিয়া বসিল। সুরেন্দ্র বলিল "ওলোকটা কে রে? যার সঙ্গে অত গল্প কর্‌ছিলি"। নীরজার কেমন লজ্জা হইল, বলিতে গিয়া কথা ফুটিল না। ভ্রাতা বলিল "লোকটা কে?"

"সেই তিনি"।

"তিনি আবার কে?

তখন নীরজা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া মাতা বলিলেন "সুরেন, তাঁর সঙ্গে কথা কস্‌নি? সুরেন বলিল "আমি কি তা জানি, আমি ভাব্‌লুম কেনা কে।"

গিরিবালা বলিলেন "হ্যাঁরে বোকা মেয়ে, সুরোকে তা বলে দিতে হয় না? দেখ্‌দেখি, সেইখানে সুরেন বসে থেকে কথা কইলে না, তিনি হয়ত কি ভাব্‌বেন ছিঃ ছিঃ।" নীরজা বুঝাইয়া বলিল "তিনি বাবা এলে আস্‌বেন।" গিরিবালা আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন "তাঁর নাম কি?"

"তাতো আমি জানিনে।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল "খুব বুদ্ধি সুদ্ধ তো—যেন নেই। আলাপ কর্‌লে, লোকের নাম জিজ্ঞাসা করে নাই।" নীরজার অভিমান হইল, বলিল "তা আমি কি করব, তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে না কেন?"

"কথা নেই, বার্ত্তা নেই, চেনা নেই, আমি হঠাৎ নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ব?"

"তা কর্‌লেই বা।"

সুরেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিল। নীরজা ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাতা বাড়ী আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া কন্যাকে বলিলেন "বেশ অভিনয় হয়েছিল, শেষের দিকটাই বেশী ভাল লাগল। নলের সারথীর বেশ, রাজ্যপ্রাপ্তি, এগুলি বড় সুন্দর করেছিল, না?" নীরজা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "হাঁ", কিন্তু মনে মনে বলিল "কই সেগুলো তো মনে পড়্‌ছে না, ভাল করে দেখিনি বোধ হয়।"

বিমলা বাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। গিরিবালা অপরিচিত যুবকের কথা বলিতে গিয়া ধরা পড়িলেন যে, তিনি থিয়েটরে গিয়াছিলেন। তবে সেই উপকারী যুবকের সংবাদ পাইয়া বিমলা বাবুর মনটা একটু খুসী হইয়াছিল, তাই বেশী কিছু বলিলেন না।

পরদিন বৈকালে বিমলাচরণ বাবু নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একটী ভদ্র যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। বিমলাচরণ ইহা শুনিয়া নিজেই নীচে নামিয়া চলিলেন। তিনি ভাবিলেন হয় ত তিনি সেই যুবক হইবেন। সিঁড়ি হইতেই দেখিলেন, একটী সুন্দর তরুণ-বয়স্ক যুবক বারান্দায় পদচারণ করিতেছে। নিকটে যাইয়া বলিলেন "উপরে আসুন"। উভয়ে উপরে উঠিলেন। বিমলাচরণ বলিলেন "আপনার নাম।"

"মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আপনি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন?"

"হাঁ, আপনার কন্যা নীরজা আমাকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।" বিমলাচরণ যুবকের হস্ত দুটী ধরিয়া বলিলেন "আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। নীরজাকে আমি বলেছিলাম আপনার দেখা পেলে আপনাকে বলে আপনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে কৃতার্থ করেন"। মোহিত অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তার পর উভয়ে নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। বিমলাচরণ যতবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গেলেন, ততবার মোহিতকুমারকে মহা ব্যতিব্যস্ত ও লজ্জিত দেখিয়া কাজেই ক্ষান্ত হইলেন। মনে মনে একটু হাসিয়া ভাবিলেন "আমাদেরও এক সময়ে উপকার স্মরণ করিয়া কেহ ধন্যবাদ দিলে এইরূপ মুস্কিলে পড়িতাম, নবীন যৌবন-কাল জীবনের বড় সুন্দর সময়।" বিমলা বাবু জানিলেন যে, মোহিতকুমারের পিতা অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তি। মোহিতকুমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এইবার প্রশংসার সহিত এম, এ পাশ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ গল্পাদির পরে বিমলাচরণ বলিলেন "আসুন, নীরজাকে আপনার আসার সংবাদটা দিই। সে হয়ত ভাবছে যে মোহিত বাবু আসব বলে এলেন না।" উভয়ে বারান্দা পার হইয়া উজ্জ্বল আলোকে শোভিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মোহিত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, নীরজা সুঠাম ক্ষুদ্র দেহটী টেবিলের উপর হেলাইয়া একখানা পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতেছিল, সে দিন শিক্ষক আসেন নাই। দূরে জানালার নিকটে সুরেন্দ্র একখানা চেয়ারে বসিয়া পুস্তক লইয়া নীরবে পাঠ করিতেছিল। বিমলাচরণ বলিলেন "নীরো, মোহিত বাবু এসেছেন"। চমকিত হইয়া ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই চাহিয়া দেখিল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সুরেন্দ্র বলিল "কে এসেছেন"?

"মোহিত বাবু"।

নীরজা মৃদু কণ্ঠে বলিল "মোহিত বাবু কে বাবা?"

বিমলা বাবু চাহিয়া দেখিলেন, মোহিত বাবু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন "ভিতরে আসুন না, মোহিত বাবু।" মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। নীরজা ও সুরেন্দ্র এইবার

চিনিতে পারিল। বিমলা বাবু নীরজার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন "চিন্‌তে পেরেছিস্? এঁরই নাম মোহিত বাবু, তুই যেমন ভাবি, তোর বাবা তোঁর চেয়ে অনেক চালাক্, আমি প্রথমেই নামটা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি"। নীরজা লজ্জায় মুখ নত করিল।

বাটীর মধ্য হইতে জলখাবারের ডাক পড়িল। বিমলা বাবু মোহিতের দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন "চলুন মোহিত বাবু, আত্মীয় স্বজনের বাড়ী এলে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়।" কাজেই মোহিতের আর আপত্তি করা হইল না। সকলে ত্রিতলে গেলেন, সেখানে রজতপাত্রে বহুবিধ জলযোগের আয়োজন রহিয়াছে। দ্বারের একটু অন্তরালে গিরিবালা দাঁড়াইয়া আছেন। মোহিত নতমুখে যাহা পারিল নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর সেই কক্ষে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মোহিত বলিল "এখন আমি যাই"। বিমলাচরণ মোহিতের হাত ধরিয়া বলিলেন "আশা করি, এখন আমাদের আলাপ হইল, আমাদের ভুল্‌বেন না, মনে রাখবেন।" মোহিত স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

মোহিতের সঙ্গে নীচের সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিমলাচরণ গিরিবালাকে বলিলেন "ছেলেটি কেমন সুন্দর! দেখেই যেন মায়া হয়, কেমন মিষ্ট কথাগুলি। ইঁহার "রূপের চেয়ে গুণের ভাগ অধিক, বি. এল পড়েন, এমন বিনয়ী আমি খুব কমই দেখেছি, বয়সও বেশী নয়, তেইশ বৎসর মোটে"।

নীরজা আস্তে আস্তে পড়িবার কক্ষে চলিয়া গেল। মনে করিতেছিল কেবল মোহিতকুমার! তাহার নামটী বড় সুন্দর বোধ হইল।

মোহিতকুমার গিয়া প্রত্যহ যেমন নিজ কক্ষে পড়িতে বসেন, তেমনি অধ্যয়ন করিতে বসিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া বলিল "দাদা খেতে চল।" দাদা হাসিয়া বলিল, "তুমি যাও, আমার আজ খাওয়া হয়ে গিয়েছে"। তাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ বলিল কোথায়? "নিমন্ত্রণে"। "তবে আর কি, তুমি শোও, তোমার তো আর খাইবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া সতীশ চলিয়া গেল। মোহিতের পিতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার এবং মহা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, দেশে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ কিছুই তাঁহার বাদ যায় না। তিনি নিজে দেশে থাকিতেন। কলিকাতার বাড়ীতে পুত্রদ্বয় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। নন্দলাল বাবু বিপত্নীক।

মোহিত গৃহের আলো কমাইয়া দিয়া শয়ন করিল। অধ্যয়ন অবসানে শয্যায় শুইয়া প্রত্যহই তাঁহার সেই তেজস্বী ঘোটকদ্বয়যুক্ত কালো ব্রহ্মমথানা মনে পড়িত এবং তাহার মধ্য হইতে একটী শুভ্রা সুন্দরী পুষ্পময়ী বাহির হইয়া চারি দিকে যেন হাসি ছড়াইয়া দিত। সেই অজস্র দয়া, পাছে কেহ দেখে বলিয়া সেই ভয়চকিত ভাব, দান করিয়া ত্রস্ত

পলায়ন, এ সব মনে পড়িয়া, মনে হইত কেমন সুন্দর। আজ মনে হইতেছিল বিমলাচরণ বাবু কি অমায়িক লোক। ওরূপ পিতা না হইলে কি ওরূপ কন্যা হয়। তাহার পর তাঁহার মনে পড়িল যে, যখন তিনি চলিয়া আসেন, নীরজা কেমন সুন্দরভাবে মস্তকটী হেলাইয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া তখনই মুখখানি নত করিয়াছিল। তখন তাহার মুখ ও চক্ষুর উপর আলোক পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইয়াছিল। নীরজাতে রূপ ও গুণ সমভাবে বিদ্যমান।

মোহিত বাবু এইরূপে কিয়ৎক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বর্ষশেষে।

বরষশেষেতে দেব! তোমার চরণে
সম্ভ্রমে প্রণতি করি' এই ভিক্ষা চাই।
কত পাপ করিয়াছি বিগত জীবনে,
এবার যেন গো প্রভু, পুণ্য পথে যাই।
এ নব বরষে বিভু? দিবে গো যে কাজ,
যেন তা সাধিতে পারি প্রীতিফুল্ল মনে,
প্রাণের দেবতা তুমি হে হৃদয়রাজ!
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জাগে যেন প্রাণে।
আর এক কথা নাথ—আমি যে দুর্ব্বল—
বিক্ষিপ্ত চিত্তের সনে হয় মহারণ।
শক্তিদাতা, দাও মোরে নিত্য নব বল,
বর্ষশেষে এই ভিক্ষা করি নিবেদন।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক,
"পানিহাটী অক্ষয় কুটীর"।

সঙ্ঘমিত্রা *

ওগো রাজ অধিরাজ! জনক আমার!
মোরে ডাকে মহেন্দ্র দূর সিংহলে
ধরম-অমিয় প্রচারে!
নির্ব্বাণ-ধনে পুরমহিলারা
খুঁজিতেছে আজ পাগলিনী পারা,
দাও অনুমতি দিয়া হৃদিধারা
পুলকে তুষিব সবারে।
নদী যবে শুনে সাগরের গান
ঠেলে ফেলে যায় সব ব্যবধান,—
তেমতি ছুটিতে চায় এ পরাণ

* মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা ভারত-সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা। তাঁহারা উভয়েই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। সিংহলরাজ দেবনাং প্রিয়তিষ্যের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ মহেন্দ্র তথায় প্রেরিত হয়েন এবং পরে তাঁহার আহ্বানে সঙ্ঘমিত্রা সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমের এক শাখা সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা খ্রীঃ পূঃ ২৮৮ শতাব্দীতে অনুরাধপুরে রোপিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। লেখক।

বিশ্বের সেবা-পাথারে!
রাজ-অধিরাজ! জনক আমার!
দাও গো বিদায় আমারে!
সুখ- শৈশবে যেমন করিয়াছি খেলা
ভাই বোন দু'টীতে মিলিয়া,
সদা হেরিয়াছ তুমি হাসিমুখে পিতা,
জননীর সাথে বসিয়া!
মহা শুভক্ষণ আসিয়াছে আজ
হবে মহাখেলা জগতের মাঝ,—
হরষিত মনে তুমি মহারাজ
আরবার দেখ চাহিয়া!
কত তাপিতের কত তাপিতার
মুছে যাবে চির-নয়ন-আসার,—
ঘুচিবে পলকে দুঃখ হাহাকার
সুগতির জয় গাহিয়া!
শৈশবের মত খেলিব আবার,
ভাইবোন দোঁহে মিলিয়া!
ওই বোধি-পাদপের পূত শাখা এক
নিয়ে যাব আমি সেখানে,
বসিয়া যাহার তলে পরম নেয়ান
লভিলা গৌতম ধেয়ানে!
মোর মনে হয় ইহারি ছায়ায়
দেবাশীস্ সম সুশীতল বায়
কোটি যুগে কোটি নত নারী হায়,
পাইবে শান্তি পরাণে!
তোমারি আদেশ মাগিহে রাজন্,
তুমি দয়াময় ধরম জীবন,
বিমুখ তিলেক হবে না কখন,
কোন্ জন ভবে না জানে।
বোধি-পাদপের পূত শাখা এক
নিয়ে যাব আমি সেখানে!
সেই শৈশবের খেলা ফুরায়েছে কবে,
এ খেলা কি কভু ফুরাবে,
ভিক্ষু তনয়, ভিক্ষুনী সুতা
আমরণ সুখা বিলাবে!
সম্রাট্ পিতা তুমি আমাদের
ভকত সেবক মহা ধরমের,
আজিকে মোদের সকল মনের
নিগূঢ় কামনা পূরাবে।
কনক-লঙ্কা চাহিছে আমায়
দাও পিতঃ! দাও আশীষি বিদায়,—
তোমারি তনয়া বুদ্ধ-কৃপায়
ভগিনীজীবন জুড়াবে!
শৈশবের খেলা ফুরায়েছে কবে,
এ খেলা কভু না ফুরাবে!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত,
"সাধনা কুঞ্জ"—চট্টগ্রাম।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"পৈতা আর গলায় রাখিতে পারি না, ইহা সাপের মত কামড়াইতেছে।" এই বলিয়া দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ পৈতা পরিত্যাগ করেন।

শিবনাথের দীক্ষায় দেশে মহা আন্দোলন উঠিল এবং তাঁহার মহাতেজস্বী পিতাকে জমীদারেরা নির্যাতন এবং স্বজাতীয় লোকে বিধর্ম্মীর পিতা বলিয়া নানা প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল। তাঁহার পিতা মাতা তখন এক দিকে শিবনাথকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং অপর দিকে আমাকে সকল অনিষ্টের মূল মনে করিয়া হরিনাভি স্কুল হইতে আমাকে অন্তরিত করিবার প্রয়াসী হইলেন। বিদ্যাভূষণ ক্রমে রক্ষণশীল ভাব ধরিতেছিলেন, ভাগিনেয়ের এরূপ আচরণে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং কেশব বাবু প্রমুখ ব্রাহ্মদিগেকে কৈশব আখ্যা দিয়া তাহাদিগের সংস্কারপ্রিয়তার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা, বিশ্বাস ও আশা ছিল। আমাকে কি বলিয়া বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া দেন? তিনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া আমি বাড়াবাড়ি না করি এবং দেশের মধ্যে ইহার আর প্রচার না হয়। আমার প্রতি দেশের লোকের বিরাগ জানাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন "দেখ তুমি যদি বুঝিয়া না চল, তোমার এত যত্নের স্কুলটীর অনিষ্ট হইবে"। পরে এই দাঁড়াইল হয় আমাকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান বন্ধ করিতে হয়, না হয় স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। আমি বলিলাম "ধর্ম্মের জন্য আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।" তখন কি খাইব, কোথায় যাইব? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলাম "আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বর যা করেন"। কার্য্য পরিত্যাগ করা হইল, স্কুলের ছাত্রগণ কাঁদিয়া আকুল। মাষ্টার ও ছাত্র পরস্পরের অশ্রুজল মিশাইয়া বিদায়কালে যে দৃশ্য হয় তাহা অবর্ণনীয়।

হরিনাভির কাজ ত্যাগ করা হইল। ত্রৈলোক্য আমার বাসায় আশ্রিত, আত্মীয় ও ছাত্র ছিলেন, তিনিও আমার অদৃষ্টের সহিত অদৃষ্ট মিশাইয়া আমার সঙ্গে ভাসিলেন। হুকোর দোকানের উপরে কয়েকটী প্রচারক বাস করিতেন, তাঁহাদের সহিত বাস করি, আর নগদ পয়সা দিয়া এক পাচকের রন্ধন পরমানন্দে ভোজন করি। হরিনাভির উপার্জ্জনের শেষ একটী আধলা মাত্র ছিল। বামাবোধিনীর সামান্য আয়ে তখন দিন চালান যাইত।

হরিনাভির কাজ ত্যাগ করা হইল, কিন্তু সমাজ ছাড়া হইল না। কলিকাতায় আরও ২।১টী বন্ধুকে লইয়া সেখানে প্রতি শনিবার রাত্রিতে উপাসনা করা যায় এবং প্রিয় ছাত্রগণ আসিয়া যোগ দেন। উৎসাহী ভ্রাতা হরনাথ এসময় খুব সহকারিতা করেন এবং প্রতি রবিবার হরিনাভিতে আইসেন। একদিন রাত্রে আমরা উপাসনা করিতেছি এমন সময় বাহিরের কতকগুলি লোক হৈ চৈ আরম্ভ করিল। এ সময় গৃহস্বামী কেদার বাবু কার্য্যোপলক্ষে লাহোরে সপরিবারে বাস করেন।

আমরা বাহিরের কোনও গোলযোগ গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনা করিতে

লাগিলাম। "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও" প্রার্থনা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে একজন আসিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। আর কয়েক জন আসিয়া দেশের বালকদিগকে ধরিয়া রাস্তায় ও তাহার ধারে কচুবনে ফেলিয়া দিল। তখন প্রার্থনা শেষ করিয়া উপাসনা বন্ধ করিতে হইল। ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলে ছাড়াইয়া আসিয়া জুটিলেন। কাহাকে কাহাকে অভিভাবকেরা ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পরে জানা গেল যে, আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়াও সমাজ বন্ধ করা গেল না, তাই কতকগুলি দেশের লোক, বিশেষতঃ তত্রত্য জমীদার জাতক্রোধ হইয়া উপাসনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা নিরুৎসাহ হইবার নহি। পর শনিবার আবার কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া আসিলাম, কিন্তু দেখিয়া অবাক হইলাম যে সমাজঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর এক কালীপ্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার পূজার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিরাশ হইয়া কোথায় যাই ভাবিতেছি এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিলেন, প্যারী কবিরাজ বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন, অদ্য রাত্রে তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে। আমরা যাইবামাত্র তিনি বলিলেন, আপনাদের উপাসনার জন্য বিছানা প্রস্তুত। যতদিন অন্য স্থান না হয়, এখানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন এবং রাত্রিতে অনুগ্রহপূর্ব্বক আহারাদিও করিবেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং প্রাণ ভরিয়া উপাসনা ও উদর ভরিয়া তাঁহার প্রদত্ত রুটী ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলাম। প্যারী বৈদ্য গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ, রোগচিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি এ অঞ্চলের ধন্বন্তরী বলিয়া গণ্য ছিলেন। লোকটীর খামখেয়াল স্বভাব, তাঁহার আয়ও যথেষ্ট, কিন্তু তিনি নিজে ও তাঁহার স্ত্রী কুটুম্ব ও অপর লোকদিগকে সাহায্য করিয়া অর্থের সার্থকতা করিতেন। বোধ হয় জমীদারের সহিত কোনও কারণে তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি এসময় আমাদের সহায় হন। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে, তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল এবং পৌত্তলিকতার প্রতি তত গোঁড়ামী ছিল না।

আমাদের উপাসনা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনালয়টী পুত্তলিকা পূজার স্থান হইবে এবং আমরা লোকভয়ে তাহার স্বত্বত্যাগ করিব, ইহা অন্যায় বোধ হইল। সত্যের জয় হইবেই হইবে এই ভরসা করিয়া আমরা উপাসনালয়টী উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাহার দ্বারা সাহায্য হইবে তখন কিছুই জানিতাম না।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিস গিলিয়ান সিটন একদিন পথে রুষিয়ান্ চর্ম্মের মলাট দেওয়া একখানি পকেট বুক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সেই পকেট বুকখানির বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র সে খানির অভ্যন্তরভাগ যে কতকগুলি কাগজ পত্রে ভরা ছিল তাহাই বাহির হইতে অনুমিত হইতেছিল। গিলিয়ান সিটন সেখানি হস্তে লইয়া কৌতূহলপূর্ণনয়নে বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট তাহার সখী মেরিয়নকে বলিল "হায়! মেরিয়ন, যদি এই পকেট বুকখানি আমার হইত"! মেরিয়ন তাহার কথার প্রত্যুত্তরে একটু রহস্যযুক্ত স্বরে বলিল—

"হাঁ! যদি মানুষের ইচ্ছাগুলি অশ্বের মত বেগবান্ হইত তাহা হইলে উত্তম হইত, কিন্তু দেখিছি এই পকেট বুকখানি কতকগুলি ব্যাঙ্ক নোটে পরিপূর্ণ। যাও জিম, নিকটে যে পুলিস আফিস আছে, সেখানকার কর্ম্মচারীদিগের হাতে এখানি অর্পণ করিয়া এস। হয়ত এজন্য তুমি পুরস্কার পেতে পারবে"।

গিলিয়ান উত্তর করিল, তাহা হইলে অতি নির্ব্বোধের মত কাজ করা হইবে। বরং ইহার ভিতরটা দেখা যাউক। তাহা হইলে পকেট বুকখানা কাহার তাহা জানা যাইবে।

গিলিয়ান পকেট বুকখানার অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—মেরিয়ন্, মেরিয়ন্, দেখ, দেখ! এই পকেট বুকখানা গিনি ও ব্যাঙ্ক নোটে পূর্ণ রহে'ছে। হায়! যদি সত্য সত্য এ পকেট বুকখানা আমার হইত"। গিলিয়ানের এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মেরিয়নের মুখখানি করুণভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মেরিয়ন বলিল—

"এ পকেট বুকখানি আর দেখিও না। আমাদের সম্মুখ হইতে দূরে রাখিয়া দাও, নতুবা ক্রমাগত দেখিতে দেখিতে আমরা লোভাকৃষ্ট হইয়া উঠিব।"

গিলিয়ান তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—

"দেখ, মেরিয়ন, 'জেনারল আর্থার আরবুথনট, ৪৪ হাইড পার্ক গার্ডেন' এই নাম ও ঠিকানা যুক্ত একখানা কার্ড ইহার ভিতরে রহিয়াছে।"

মেরিয়ন ইহাতে সহানুভূতিসূচক ভাবে প্রণোদিত হইয়া বলিল—

"হায়! হতভাগ্য আরবুথনট! এই ক্ষতির জন্য না জানি তিনি কতদূর দুঃখিত হয়েছেন। জিম, তোমার এখানি হাইড-পার্ক গার্ডেনের ঠিকানায় লইয়া যাওয়া উচিত।"

গিলিয়ান পরিচ্ছদ পরিধানের টেবিলের

পার্শ্বে উপবিষ্ট তাহার সখী মেরিয়নের পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং সবেগে পকেট বুকখানি বন্ধ করিয়া বলিল—

"দূর হউক! যতই আমি এই পকেট বুকখানা দেখিতেছি, ততই ইহার প্রতি আমার লোভ হইতেছে"। ইহার অল্পক্ষণ পরেই সে বলিল—

"দুইটা কাজের মধ্যে একটাও পাওয়া যাইবে না।

আমার বোধ হয় আমি কখন কোন কাজ পাইব না"।

মেরিয়ন তাহার কথার উত্তরে বলিল—"প্রিয় জিম, নিরাশ হইও না"।

(ক্রমশঃ)

বাপীতীরস্থ বালিকা।

বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য "আনন্দ" এক দিন ধর্ম্মপ্রচারার্থ কোন গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে পিপাসার্ত্ত হইয়া, একটি কূপের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তথায় দেখিলেন একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা কূপ হইতে জল তুলিতেছে।

"আনন্দ পিপাসায় কাতর হইয়া বালিকার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অয়ি বালে! তোমার নাম কি? আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, তুমি আমাকে এক ঘটি জল দান করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও"।

বালিকা উত্তর করিল "হে ব্রাহ্মণ! "আমার নাম 'প্রকৃতি', আমি শূদ্র-বংশীয়া কন্যা, আপনাকে কিরূপে পানার্থ জল দিব। আমার হাতের জল পান করিলে আপনার দোষ হইবে"।

আনন্দ তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন "আমি ত তোমার জাতি কি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি কেবল পিপাসায় কাতর হইয়া জল প্রার্থনা করিয়াছি"।

ইহা শুনিয়া প্রকৃতির প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। সে সত্বর আনন্দকে তৃষ্ণার জল দান করিয়া তৃপ্ত করিল।

আনন্দ জল পান করিয়া বালিকাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু "প্রকৃতি" সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত পথিকের সঙ্গ ছাড়িল না, ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়া আনন্দ যে কোথায় অদর্শন হইলেন, তাহা আর প্রকৃতি বুঝিতে পারিল না।

অবশেষে প্রকৃতি একজন সিদ্ধ পুরুষের নিকট গিয়া জানিতে পারিল যে, আনন্দ গৌতম বুদ্ধের একজন শিষ্য। তখন প্রকৃতি সিদ্ধ পুরুষের চরণে পতিত হইয়া

মিনতি করিয়া কহিল "হে প্রভু! আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই মহাপুরুষের নিকট যাইবার পথ দেখাইয়া দিন, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয় অতীব কাতর হইয়াছে। তাঁহার ভক্তশিষ্যা হইয়া চির-জীবন কাটাইব এই বাসনা আমার প্রবল হইয়াছে"। সিদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ স্বতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি কহিলেন "প্রকৃতি! আমি তোমার অন্তঃকরণ প্রেমপূর্ণ দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু তুমি নিজের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিতেছ না।

তুমি আনন্দের প্রতি অনুরাগিণী নহ, তুমি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের ভক্ত, তবে যে দয়া ও অনুগ্রহ আনন্দের হৃদয়ের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তোমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে তাহা লইয়া তোমার নিজের হৃদয়ের নম্রতা দ্বারা অন্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিও।

বস্তুত রাজার পক্ষে দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক, কিন্তু যখন দাস নির্দ্দয় ব্যবহার সহ্য করিয়া তাহা প্রকাশ করে না, তখন তদ্দ্বারা তাহার তদপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, ইহাতে সে সকলের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মের উৎসাহ দেখায়।

সে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা করে না, কিন্তু সে যখন অত্যাচারকে দমন করিতে অক্ষম হয়, তখন গর্ব্বিত আত্ম-শ্লাঘাকারীর আচরণকে দয়া ও প্রেম দ্বারা পরাজয় করে।

সিদ্ধ পুরুষ প্রকৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "তোমার নীচ বংশে জন্ম হইয়াছে বটে, তথাপি তোমার নিকট হইতে শিক্ষা লওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তুমি নর ও নারীগণের মধ্যে আদর্শস্বরূপা হইবে। ন্যায় ও ধর্ম্মপথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইও না, তাহা হইলে তুমি রাজকীয় মহিমা অপেক্ষা অধিকতর দীপ্তিমতী হইবে।"

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

নূতন সংবাদ।

মান্দ্রাজের মহিলাগণ এক সভা আহ্বান করিয়া লর্ড কারমাইকেলকে প্রীতি উপহার প্রদান করিয়াছেন। সেই সভাতে লেডী কারমাইকেল বলিয়াছেন "ভারতীয় রমণী ও আমাদের মত বিদেশিনীগণের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ঐক্যই বেশী বলিয়া মনে হয়। ইংরাজই হউক আর ভারতবাসীই হউক, ভারতের যাহাতে উন্নতি হয়, ভারতবাসী যাহাতে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহাই সকলে ইচ্ছা করেন। আমাদের অপেক্ষা আপনারা ভারতবর্ষকে

অধিক ভাল বাসেন, কিন্তু আমরাও ভারতবর্ষকে ভাল বাসি ও তাহার হিত কামনা করি। ভারতবর্ষ যে ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত ইহাতে আমরা গৌরব বোধ করি। আপনারাও যদি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৌরব মনে করেন, তাহা হইলে আমরা একত্র কার্য্য করিবার সুবিধা পাই। রমণীগণ যে কার্য্য হইতে বঞ্চিত, তাহা আমাদের স্বামী পুত্রগণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরাও প্রতিবাসীদিগের সুখ ও শান্তি বিধানের সাহায্য করিতে পারি। আমরা পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যদি পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকে, তবেই আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারিব এবং তাহা হইলেই একত্র কার্য্য করিতে সমর্থ হইব।

ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম, বি আগামী বৈশাখ মাস হইতে 'স্বাস্থ্য সমাচার' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন।

ইংলণ্ডে নারীজাতিকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিবার জন্য পার্লামেণ্টে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু সুইডেনে ঐ বিষয়ে নারীজাতির অধিকার প্রদানের জন্য এক বিল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আলোচিত হইয়াছে যে, পুরুষেরা যেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলে সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন, স্ত্রীলোকেরও সেই সেই যোগ্যতার প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা তিন বৎসর ট্যাক্স দেন নাই, তাঁহাদের স্ত্রীগণ ভোট দিতে পারিবেন না।

বরোদায় এক মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বামারচনা।

প্রণাম।

(প্রভাতে)

১

প্রভাতের সমীরণ ধীরে বয়ে যায়।
পরিয়া কনকভূষা,
ধীরে দেখা দিল উষা
উদিল নবীন ভানু আকাশের গায়।
শয্যা ত্যজি নরগণ
স্মরিতেছে নারায়ণ।
সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশে প্রণমে সবায়।
আমার প্রণাম শুধু ও রাতুল পায়

২

যেথায় যে ভাবে থাক ধর এ প্রণাম।
ভাসিয়া নয়নজলে,
উদ্দেশে ও পদতলে
সদা দিই প্রেমাঞ্জলি সহ প্রাণারাম!
দিবা নিশি অবিরত,
ওই পদে মম চিত,
সুখ, মোক্ষ, স্বর্গ মম ওই পূত নাম।
উদ্দেশে যুড়িয়া কর,
অভাগিনী মাগে বর

ক্ষমা কর দেব, আর থাকিও না বাম,
ও চরণে ঠাঁই দাও পূর্ণ কর কাম।
একা সংসারের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই।
যে জ্বালায় জ্বলি হায়!
সে কথা বলিব কায়?
তোমা বিনা কে বুঝিবে কি যাতনা পাই!
দাসীর প্রণাম ধর,
হে দেব আশীষ কর,
মিশে যাক এ জীবন চরণে তোমার।
শুকাক নয়নজল,
শান্ত হোক হিয়াতল,
পিছনে পড়িয়া থাক এ বিশ্ব সংসার।
দাঁড়াও অভয় বেশে সমুখে আমার।

পিতা।

দুর্জ্জয় সংসার এই
আঁধার অজ্ঞান পথে
তুমি চির ধ্রুবতারা
জ্বলিছ এ অন্ধ-চিতে।

(২)

কি যেন দেবের মন্ত্র
কি গুরু কর্ত্তব্যভার,
হে মহান্ হৃদিমাঝে
জাগিতেছে অনিবার।

(৩)

কিবা দুঃখে কিবা সুখে
তুমি ত রয়েছ জাগি,
অচল পর্ব্বত সম
কি দৃঢ় মূরতি আঁকি!

(৪)

তুমি ত আশ্রয়-তরু
কি দিব্য শান্তির ছায়া,
তুমি ত আঁধারে আলো
মধুর সান্ত্বনা কায়া।

(৫)

তোমার হৃদয় সিন্ধু
গৃহে যেন মন্দাকিনী,
বহে শতধারে দেব,
সে প্রেম অমিয়খনি।

(৬)

নৈরাশ্য দুঃখেরে লয়ে
কাটে যদি দণ্ড পল,
ভেঙ্গে ফেলে দেয় সব
তোমার সে হৃদিবল।

(৭)

কঠোর সংসারক্ষেত্র
ও তব চরণতল,
সহায়-সম্পদ-হীনে
জাগাইছে কত বল!

(৮)

তোমার একটি বাণী
অমৃতের ধারা সম,
জটিল সংসারমাঝে
কি বিশ্বাসে ছুটে যেন।

(৯)

তোমার বিশাল মন
চিরপূজ্য আকাঙ্ক্ষিত,

ভূতলে "দেবতা" সম
রও তুমি বিরাজিত।
(১০)
আর কিবা অপার্থিব,
স্বরূপ কাহার নাম,
এ ভব সংসার আর
যাচে কোন্ মোক্ষধাম ?
(১১)
এ তো এই মর্ত্ত্যকুলে
মানবের লক্ষ্য তারা,
শোক তাপ দুঃখ বুকে
কি মধুর শান্তি-ধারা !
(১২)
নিবিড় ধরণীবুকে
এই তো রয়েছে ফুটি,
চিরপূজা আকাঙ্ক্ষিত
মানবের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ! !

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ,
করিমগঞ্জ।

আবাহন।

আমার এ নব বসন্ত বিফলে যে যায়,
তুমি এস হে তুমি এস,
আমার ভয়হৃদয়ের পরতে পরতে
তুমি বস হে তুমি বস।
এই পিকমুখরিত, অলিগুঞ্জরিত,
এই মন্দ-মলয়সমীর-সিঞ্চিত
এই নব-পল্লব-পুলকিত
মম নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে
আমি পেতেছি হেথা রতন-আসন,
রচিয়াছি হেথা কুসুম-শয়ন,
আমার যত অভিলাষ যত আকিঞ্চন
সাজায়ে রেখেছি পুঞ্জে পুঞ্জে
শুধু তুমি এস হে এস।
সব আয়োজন হইবে সফল,
পরাণে জাগিবে সঙ্গীত তরল,
সকলি অমিয় সকলি অমল,
ফুটিবে নয়নে হাসি ;
(এ নয়নে) শুধু ও মুখ রাখিব,
(এ হৃদয়ে) শুধু ও ছবি আঁকিব,
মধুর সঙ্গীত শুনাব শুনিব,
সুখের সাগরে ভাসি।
তুমি এসহে তুমি এস।
আমায় সকল ধনে করিও বঞ্চিত,
যত চাও তত করিও লাঞ্ছিত,
হে চির-আরাধ্য হে চির-বাঞ্ছিত,
শুধু এক কথা রেখ হে,
সব আকিঞ্চন দিওগো ভাঙ্গিয়ে
সকল সম্পদ চরণে দলিয়ে,
সাধের কানন চির উজলিয়ে
তুমি থেক তুমি থেক হে।

শ্রীমতী সরসীবালা দত্ত,
সাতক্ষীরা।

কোকিলার বাসন্তী পূজা।

১

আজি তব আগমনে, ওগো বাণী সুবদনে,
ধরণী বসন্তসাজে সাজি,
তোমারি চরণতলে, দিবে প্রেম অর্ঘ্য বলে,
উল্লাসে প্রকৃতি পুন আজি।

২

উদ্‌বাটিয়া মন প্রাণ ভক্তের ভকতি দান,
সযতনে আহরণ করি,
উৎসর্গ করিবে পদে পুত্রি নব কোকনদে,
এই আশা আছে প্রাণ ধরি।

৩

সারা বর্ষ আছে চেয়ে, তব নাম গেয়ে গেয়ে,
ওগো বিদ্যাময়ী সনাতনী।
মানবের শিক্ষাদাত্রী, প্রণবে তুমি গায়িত্রী,
একমাত্র জ্ঞানসঞ্চারিণী।

৪

একরূপা বহু রূপে, প্রতি কণ্ঠে সুখে দুঃখে,
নানা ছন্দে, নানা রসে ভরি,
কোমল করুণ আদি, শান্ত রৌদ্র বীভৎসাদি,
প্রকাশয় নানা মূর্ত্তি ধরি।

৫

কঠিন সাধনা বিনা, তোমারে কেহ পায় না,
সর্ব্বত্যাগী সংযমী না হ'লে।
অলস বিলাসী জন, নাহি পায় দরশন,
কেঁদে মরে অকৃতির ফলে।

৬

দেবের অসাধ্য তুমি, তরাইতে মর্ত্তভূমি,
সৌরভিত কমল আসনে।
মোহিয়া নরের প্রাণ, ঝঙ্কারিয়া বীণাতান,
উদিলে গো বসন্ত বিয়ানে।

৭

পীতাভ পলাশকুল, কনক আভার তুল,
থরে থরে দুলে শাখাতলে।
ভালবাস বুঝি সখী, সোনালি বরণ দেখি,
ঐশ্বর্য্যের মহিমা যে ঝলে।

৮

হিমানীর স্নিগ্ধ কর, বালারুণে মনোহর,
নব ছবি চিত্রিয়া আলোকে।
কোমল হরিত পত্রে আভরণে মঞ্জুগাত্রে,
হাস্যময়ী ধরণীর বুকে।

৯

দাঁড়ায়ে পাদপ লতা, মৃদু মুখে কহে কথা,
বীণাপাণি ধরিতে আবেগে।
ভ্রমর ভ্রমরী দোঁহে, প্রেমের মদিরা মোহে,
প্রদক্ষিণ করে অনুরাগে।

১০

পিকবধূ লাজভরে, ঘোমটা টানিয়া ধীরে,
সরে যায় কুসুম আড়ালে।
বলে গাহিব না আর, আজি বসন্ত বাহার,
"কুরূপা" বলিয়া লোকে ছলে।

১১

উপহাসে কাকাতুয়া, সাদামুখে ধরে ধুয়া,
শ্যামা বুলবুলি ক্ষুণ্ণাননে।
সহে না অবজ্ঞা প্রাণে, কাঁদি সমীরণ সনে,
উড়িয়া যায় গো নভ পানে।

১২

তাই আজি সৌনমুখে পূজিব মনের দুঃখে
রূপের বাসনা হৃদে লয়ে।
রূপগুণ একাধারে দেহ দেবি কৃপা করে,
বিহগীর ক্ষুদ্র কায়ায়।

১৩

গহন কাননমাঝে আঁধারে ধূসর সাঁঝে
আলোকিয়া বিহঙ্গমদেশ
গাহিব বন্দনা তব, গাঁথিয়া গো গাথা নব,
এই মম বাসনার শেষ।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

"মা"।

(১)

মধুরতা-ময় কথা অশান্তি-মাঝারে,
আছে শুধু "মার" নাম জগত ভিতরে,
হেন শান্তিময় কথা
নরের শান্তির লতা,
জিনিয়া স্বর্গের কান্তি প্রীতি উচ্চারণে
কোথা হ'তে কে আনিল সংসার কাননে!

(২)

প্রত্যেক অক্ষরে যেন অমৃতলহরী,
খেলিতেছে ধীরে ধীরে রসনা উপরি,
অশান্ত মানবগণে
শান্তি সুধা বিতরণে,
সদা নিয়োজিত যেন ধরণী উপরি,
বিকশিত সদা যেন প্রকাশি মাধুরী।

(৩)

অমৃতভাণ্ডারমধ্যে দেবের আগারে
এমন অমূল্যরত্ন আছে কি সে পুরে?
অথবা বৈকুণ্ঠধামে,
অথবা জলধিতলে,
প্রবালাদি মণিরত্ন যথায় বিহরে,
কৌস্তুভরতন আদি আছিল যে পুরে?

(৪)

কেবল ভাষার যার এতই গরিমা,
অমৃতলহরী যার নাহি জানে সীমা,
নামে যার মধুরতা,
যার এত পবিত্রতা,
না জানি সে ধনে আছে কতই মাধুরী,
বর্ণিতে অক্ষম আমি আহা মরি মরি।

(৫)

শোকে, তাপে, দুঃখে যবে কণ্ঠে আসে প্রাণ,
শত ক্লেশ ভুঞ্জি সবে হ'য়ে হতজ্ঞান
আসে যবে শান্তি আশে,
আপন গৃহের পাশে,
সে সময় কিবা বল আসে শান্তি দিতে?
আসে এই "মা" কথা সুধা বরষিতে।

(৬)

শারদ গগনবক্ষে যবে নিশাপতি
দেখায় জগতমাঝে আপন মূরতি,

তাতে বা কতই শোভা,
বর্ণিতে তা পারে কেবা ?
কিন্তু দেখ ততোধিক আছয়ে সুন্দর,
শিশুমুখে "মা" কথা অতি মনোহর।

(৭)

বসন্ত কোকিলধ্বনি বড়ই মধুর
অথবা রমণীকণ্ঠে সপ্তমের সুর
কিম্বা তরঙ্গিণীধ্বনি
অতীব মধুর গণি,
ততোধিক মধুরতা আছে "মা" কথায়,
সাধক পরাণ ভরি ডাকেন যথায়।

(৮)

জগতে এই "মা" কথা যদি না থাকিত,
সংসার-সুখের রবি হ'তো অস্তমিত,
নৈরাশ্যের দাবানল
দহিত সংসার-তল,
তাণ্ডব করিত সদা প্রেতনীর দল
ধ্বংসের করাল গ্রাসে পড়িত সকল।

(৯)

জগতে আসিয়া মোরা শিখেছি সকলে,
সেই প্রাণভরা কথা অতি কুতূহলে,
কিন্তু একদিন তরে
স্মরিনি জগন্মাতারে,
যার অনুগ্রহে মোরা আছি নিরাপদে,
(মাগো!) অন্তিমেতে স্থান দিও তোমার
ও পদে।

শ্রীসরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী,
লক্ষ্মোদরপুর,
পোঃ - সিউড়ি।

১৩১৮ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অঞ্জলি (পদ্য)	২০৩
অদ্ভুত খাদ্য দ্রব্য	৯০
আংটী	২১৩
আন্তরিক পবিত্রতা	২৭, ৮৭
আমার জীবনের একটী ঘটনা	২২০
আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারকর্ত্তা	৪৬
আর্য্য রমণী	১৭
ঈশ্বর (পদ্য)	২৬
ঈশ্বরতত্ত্ব	৩৪১
ঈশ্বরের উপর নির্ভরে শান্তি	২৩৫
৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্ম-জীবনী	৮৮, ১২২, ১৪০, ২১৯, ৩১৯, ৩৭৮
১৯১১ সনের ২২শে জুন লণ্ডন নগরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে (পদ্য)	৭২
ঐতিহাসিক ঘেঁটু পূজা	৩৪৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল	৪৮
কোচবিহারাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকালবিয়োগে (পদ্য)	১৩৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ক্রোধ	২৪৫
গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব	৩৮১
গৃহ-চিকিৎসা	৩৯
গৃহ-শিক্ষা	৩০০
চরিত্রবল	৪,৬৭
চারিত্রিক ইতিকথা	১৭৮
ছোট লোক কে?	১৯৭
জীবন চক্র	৪৭
তীর্থ	২২৪
দাতা চিরং জীবতু	১৫৬
দুইটী বন্ধু	১৯,৭৫,১০০,১৪৪
দুর্ব্বার চটি	৫০
দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ	৪৫
নববর্ষ	২
নববর্ষে ভিক্ষা (পদ্য)	৩
নিবেদন (পদ্য)	৩৫৫
নূতন সংবাদ	৫৯,৯২,১২৪,১৮৭,২৫৯, ২৯১,৩২৫,৩৫৬,৪৮৩
পরশমণি	৫২
পাচন ও মুষ্টিযোগ	৯১
পুস্তকাদি সমালোচনা	১৮৯,২৫৯
পূজা (পদ্য)	৩৫৫
প্রতীকার	১৯৯
প্রাচীন ভারতের অনুলেপন দ্রব্য	১৮১, ২০৪
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির প্রতি আচরণ	২৮২
প্রায়শ্চিত্ত	২৭৩,৩৩৫,৩৬৮
প্রার্থনা (পদ্য)	১১,৪৪,৮৭,২০৪,২৭৭
প্রেমময় (পদ্য)	১৪
ফুল (পদ্য)	২২১
ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণ	১৩৫, ২৬৮
ভারত সম্রাটের প্রতিগমন (পদ্য)	২৯১
ভারতে নব সম্রাট (পদ্য)	২১৬
ভারতে রেশম-শিল্প	১২৫
ভূত না মানুষ	৩৩,১১,১৫৮, ২৩৯,৩০৬,৩৩৩
ভৈরবী	১১,৮২
ভ্রমণকাহিনী	২৭৮
মহীধর (পদ্য)	৩৬৬
মা (পদ্য)	৩৮৮
মানবীয় অভিমানের দশ দশা (পদ্য)	২৪৯
মারসী মারডিল	২৫৭,২৭৯,৩২২,৩৫১
মৃত্যু বিষয়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ	৪৪
লেডী মেরী	১৬৬
বর্ষশেষে (পদ্য)	৩৭৭
বাঘের আত্মকাহিনী	২৮৫
বাপীতীরস্থ বালিকা	৩৮২
বামাবোধিনীর ঊনপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব	১২৯
বামাবোধিনীর জন্মদিনে (পদ্য)	১৩০
বিবাহ (পদ্য)	১৭০
শাক্যসিংহ বা বুদ্ধদেব (পদ্য)	৩১৪
শিক্ষা	১৮৪
শোকসন্তপ্তা মাননীয়া মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরীর চরণে ভগ্নীর অশ্রুজল (পদ্য)	১৪১
সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা	১
সজ্জনমিত্রা (পদ্য)	৩৭৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সতাম্ শাস্ত্রমনশ্বরম্	২৫৩
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩, ৬৫, ৯৭, ১৩১, ১৯৩, ২৬৫, ২৯৭, ৩২৯, ৩৬১	
সেণ্টপলের পত্রাবলী	১৬১
স্ত্রীলোকের কাজ ১৫, ৯৮, ১৯৫, ২৬৬, ২৯৮, ৩৩১, ৩৬৪	
স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ	৮
স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি	২০৬
স্বর্গীয়া প্রিয়বালা	২৮
স্বামিভক্তি (পদ্য)	৪৩
স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব	৫৯
হিন্দুগৃহে বধূযন্ত্রণা	১৭১
বামারচনা।	
আজাঞ্চা	১২৬
আকিঞ্চন	৬৩, ৩২৭
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়	২৯৩
আত্মীয়	২৬৩
আমার দেবতা	২৬২
আবাহন	৩৮৬
কোকিলার বাসন্তী পূজা	৩৮৭
একটী সাধ	৬২
কুটীরে	১৯৫
কেন এসে চলে গেল	৬৩
চাঁদের প্রতি কুমুদিনী	১৮৯
জাহ্নবীতীর	৩৫৮
তুমি ও আমি	৩৫৭
তুমি ত আমার	৬২
দীপ্ত আঁধার	১৯১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নিবেদন	১৮৯, ২৬২
পিতা	১৯০, ৩৮৫
প্রণাম	৩৮৪
প্রার্থনা	২৬১
প্রেম	৯৪
ফিরে যাও	৩৫৯
মা (পদ্য)	৩৮৮
মিনতি	৯৫, ২৬৪
মৃত্যু	১২৭
রাজ অভ্যর্থনা	২৯২, ৩২৭
রাজসূয় যজ্ঞ	২৯৪
বর্ষবিদায়	৬০
বাসনা	৯৪
বিশ্বাস	৩৫৭
বৈশাখী	৬১
শুভ আগমন	২৬৪
শোকগাথা	৩৫৮
সংসার	২৬০
সঙ্গীহারা	৯৬
সম্রাট আগমনে	২৯৫
সাধ	৩৬০
সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে	৯৫
স্তোত্র	৯৩
হরিভক্তি	১২৬
চিত্র।	
রাজ্যাভিষেক পরিচ্ছেদে রাজা জর্জ্জ ৫ম ও রাণী মেরী	
পৌষ, ২৬৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে।	

ভ্রম-সংশোধন।

১। গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় কেবল বৈশাখ আছে, উহা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ হইবে।

২। বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের পত্রিকায় ১২৯ পৃষ্ঠায় আশ্বিন, কার্ত্তিক না হইয়া ভাদ্র, আশ্বিন হইবে।

৩। গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় ২২৪ পৃষ্ঠার পর ২২৫ না হইয়া ভ্রমবশতঃ ২৩৩ ছাপা হইয়াছে এবং তাহার পর ২৩৩ হইতেই গণনা হইয়া গিয়াছে।

৪। এই বৎসরের পত্রিকার উপর পৃষ্ঠায় (মলাটে) ২য় ভাগ, ভিতরে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ৪র্থ ভাগ ও অন্যান্য পৃষ্ঠার উপরে ৩য় ভাগ ছাপা হইয়াছে। তাহা না হইয়া সর্ব্বত্র ৪র্থ ভাগ হইবে।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।